আলাপ ১

বিষয় বিশ্বায়ন

রংগন চক্রবর্তী
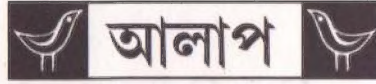
আমরা এমন এক সময়ে বাস করি যখন চারিদিকে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে কিন্তু দুনিয়া পাল্টে ফেলা এই তথ্য বিস্ফোরণের যুগেও বহু জরুরি বিষয় —যেগুলো আমাদের জানা ও বোঝা দরকার—সেগুলো বুদ্ধিজীবী নন এমন মানুষজনের সহজ নাগালের মধ্যে আসছে না। 'এবং আলাপ' নামে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশ্বাস করে তথ্যের বন্টন এবং সহজবোধ্য আলোচনা হওয়াটা জরুরি যাতে সাধারণ মানুষ তাঁদের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আরো বেশি করে ভাবতে পারেন এবং এর মধ্যে দিয়ে একটা সক্রিয় জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

আলাপ সিরিজ নামে বাংলায় একগুচ্ছ বই প্রকাশের উদ্দেশ্য হলো আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে এমন কিছু বিষয় ও ধারণা সম্পর্কে ধোঁয়াশা কাটিয়ে পরিষ্কার আলাপ-আলোচনার আলোয় নিয়ে আসা। সাধারণত এই বিষয়গুলো সাধারণ বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য এবং কথার কচকচি ভরাই থেকে যায়। আলাপ সিরিজ এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে বুদ্ধিজীবী নন এমন পাঠক বইগুলি থেকে মস্তিষ্কের খোরাক পেতে পারেন। পাঠকের আগ্রহকে একধাপ এগিয়ে দেওয়ার জন্য লেখার সঙ্গে বইগুলির পাতা জুড়ে থাকছে ছবির ভাষ্য। এই সিরিজে প্রকাশিত ও প্রস্তাবিত কয়েকটি বই :

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস ।অনুরাধা চিনয়
পথে বিপদেঃ মেয়েদের নিরাপত্তা ।ভাস্বতী চক্রবর্তী
মুসলমান-হিন্দু সংলাপ ।শুভেন্দু দাশগুপ্ত
বেদ থেকে হিন্দুত্ব ।কুমকুম রায় ও তনিকা সরকার
উন্নয়ন। অনিতা অগ্নিহোত্রী

বিষয় বিশ্বায়ন

লেখা

রংগন চক্রবর্তী

ছবি

অমিতাভ মালাকার

সম্পাদনা

শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত

এ ব ং EBONG
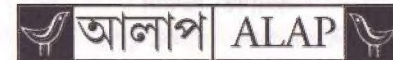
কলকাতা ২০০৪

Alap 1
Bishay Bishwayan
Demystifying Globalization
by RANGAN CHAKRAVARTY

প্রথম প্রকাশ ২০০৪

ISBN 81-902306-0-3

চিত্রবিন্যাস : তরুণকান্তি বারিক
পরিকল্পনা : অমিতাভ মালাকার

এবং আলাপ
১৫৮/২এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪৫
কর্তৃক প্রকাশিত

রনি গুপ্ত
লীলাবতী প্রিন্টার্স
পি ৫৪ আনন্দ পালিত রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪
কর্তৃক মুদ্রিত

এই বই সম্পাদনায় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন শুভেন্দু দাশগুপ্ত, মুকুল মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, সুরঞ্জন গুপ্ত, শোভন তরফদার, পয়োষ্ণি মিত্র, পারমিতা চক্রবর্তী, প্রদীপ রায়, কবিতা পাঞ্জাবী, সারদা বালগোপালন, দিলীপ সিমিয়ন, অভিজিৎ সেন ও স্বাতী গাঙ্গুলী।

অমিতাভ মালাকারের আঁকা ছবি ছাড়াও এই বইয়ে আরো কয়েকটি ছবি ব্যবহৃত হয়েছে মূলত তিনটি বই থেকে—*ক্যারি ইট অন। আ হিস্ট্রি ইন সঙ অ্যান্ড পিকচারস অফ আমেরিকান ওয়ার্কিং মেন অ্যান্ড উইমেন* (সাইমন অ্যান্ড শুস্টার, ১৯৮৫), *ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফি* (টাইমলাইফ ইন্টারন্যাশানাল, ১৯৭০) এবং *দ্য স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন* (ইউনিসেফ, ২০০০)। এছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে *ইন্ডিয়া টুডে* ও *স্টেটসম্যান* পত্রিকার কাটিং এবং *ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস ওবজারভার* (মার্চ ১৯৯৯) ওয়েব ম্যাগাজিন থেকে একটি ছবি।

এই বই যাঁদের কাছে পৌছোবে তাঁরা 'এবং আলাপ'-এর দপ্তরে চিঠি লিখে জানাতে পারেন তাঁদের বক্তব্য এবং আর কোন কোন বিষয় তাঁরা এ ধরনের আলাপ-আলোচনা চান।

কৃষ্ণা ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে

কী জানব, কেন জানব, কীভাবে জানব

একটি কথায় বুঝে যাব,
জীবন অত সহজ নয়
ভাবতে হয়, লড়তে হয়,
নিজের মানে গড়তে হয়।

এই বইটাতে আমরা লেখা আর ছবির মধ্যে দিয়ে বিশ্বায়ন নিয়ে ভাবার, বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করব। আবার একটা বই কেন? জানার উপায়ের কি কোনো অভাব আছে? নেট, টেলিভিশনে নানা চ্যানেল, ই-মেল, পত্র-পত্রিকা খুললেই তো তথ্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, এও তো বিশ্বায়নেরই ফল।

এই বইয়ে আমরা তথ্য আর জ্ঞানের মধ্যে একটা তফাত করতে চাই। জ্ঞান বলতে আমরা গুরুগম্ভীর কিছু বোঝাতে চাই না। জ্ঞান বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছুকে তলিয়ে দেখে, আমাদের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা। এই যে কিছু চটজলদি 'ফ্যাক্ট'কে 'সত্য' হিসেবে জেনে রাখার উৎসাহ, এটা সবটাই খুব নিরীহ ব্যাপার হয়তো নয়। আমরা দেখছি চারদিকে কুইজ বাড়ছে, পাশাপাশি বহু

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি এটা আমাদের সত্যিকারের প্রশ্ন করার অভ্যাসকে নষ্ট করে দেয়। আমরা ফাঁকি আর ওপরচালাকির একটা ফাঁদে জড়িয়ে পড়ি, কার্য-কারণ সম্পর্কগুলোকে খতিয়ে দেখার অভ্যাস হারিয়ে ফেলি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কোনো স্কুলের বাচ্চাকেও যদি বলি সাজাও দেখি—ইংল্যান্ড, নাইজিরিয়া, ফ্রান্স, পেরু, ভারত, বেলজিয়াম দেশগুলোকে—বলো কারা উন্নত দেশ, আর কারা অনুন্নত? বলা বাহুল্য, বাচ্চা বুদ্ধিমান হলে আমরা এই তালিকাটা পাব :

উন্নত দেশ: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম
অনুন্নত দেশ: নাইজিরিয়া, পেরু, ভারত

কালোরা নাকি আসলে মাথাগরম ফাঁকিবাজ!! আরে, আমার মতো লক্ষ লক্ষ কালো মানুষের ঘাম-রক্ত দিয়েই তো তোমাদের চিনি, কফির চাষ হলো, ব্যবসা হলো, আর আমি হলাম অলস?

আমরা হাততালি দেব, সে প্রাইজ পাবে কোনো মালটি-ন্যাশনালের গিফট কুপন। সে তো যা জানে সেই অনুযায়ী ঠিকই বলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তার কি জানা দরকার ছিল না যে আচ্ছা, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা—এই তিনটে মহাদেশের বেশিরভাগ দেশ অনুন্নত হয় কেন? ইউরোপের দেশগুলো, আমেরিকা, এরা উন্নত হলো কীভাবে? অন্য দেশগুলো যে ইউরোপের উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিল, সেই দেশগুলো থেকে দাস শ্রমিক ধরে এনে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মেরে শেষ করে দিয়ে যে সাম্রাজ্য বানানো হয়েছিল, তার সঙ্গে কি আজকের এই উন্নতি অনুন্নতির কোনো সম্পর্ক আছে? এই কথাগুলো তো এক একটা দেশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে, শুধু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়েই নয়, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়েও। শুনলে মনে হয় যে কিছু দেশ যেন বরাবরই উন্নত, আর কিছু বরাবরই অনুন্নত।

তাহলে একটু ভেবে দেখলে হয় না যে উপনিবেশবাদীরা উন্নত হলো কীভাবে? আর যাদের দেশ দখল হয়ে উপনিবেশ হয়ে গিয়েছিল তারাই বা অনুন্নত হয়ে গেল কী করে? ১৪০০ শতকের শেষ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় কয়েকটি দেশ যেমন স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার একটা বিশাল অংশ অধিকার করে নিজেদের উপনিবেশ বানিয়েছিল। এর আগে ইউরোপের বাইরের দেশগুলো অনেকেই ছিল রীতিমতো সমৃদ্ধ। অন্য অনেক দেশের সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্য রমরম করে চলছিল। কাপড়, মশলা, নানান ধরনের কৃষি ও শিল্পজাত জিনিসের প্রচুর বাজার ছিল দেশে বিদেশে। সেই সময়ে কোনো বাচ্চা একটা তালিকা তৈরি করলে সেটা এরকম হতেই হয়তো পারত :

উন্নত দেশ : নাইজিরিয়া, পেরু, ভারত
অনুন্নত দেশ : ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম

উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বহু দেশের মধ্যে সম্পর্ক কিংবা ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি বদলে যায়। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা ইউরোপ বা আমেরিকাকে উন্নত দেশ বলে ধরে নিই, আর পাশাপাশি আফ্রিকা, এশিয়ার অনেক দেশকে অনুন্নত বলে চিনি, তখন মনে রাখা দরকার যে এই ধারণাগুলো একটা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে, এগুলো কোনো স্বাভাবিক, চিরন্তন ধারণা মোটেও নয়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অধিকাংশ উপনিবেশগুলো স্বাধীনতার লড়াই জিতে মুক্ত হলো। ষাট-সত্তরের দশকে তারা বেশ একটা যৌথ শক্তি হিসেবে খানিকটা মাথা চাড়াও দিয়েছিল, তখন আমরা এই দেশগুলোকে সামগ্রিকভাবে বোঝাবার জন্য অনুন্নত কথাটাকে একটু নরম করে 'উন্নয়নশীল' কথাটার ব্যবহার দেখি। আবার একদিকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো 'প্রথম বিশ্ব' আর অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়া আর চীনের সমাজতান্ত্রিক 'দ্বিতীয় বিশ্বের' বাইরে একটা 'তৃতীয় বিশ্বের' ধারণাও উঠে আসে। ইদানীং অনেকেই উন্নত-অনুন্নত-র মধ্যেকার বিভাগটাকে পৃথিবীর ম্যাপ অনুযায়ী নর্থ অ্যান্ড সাউথ বা উত্তর আর দক্ষিণের দেশের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা বিভাজন হিসেবে দেখছেন। এতে উপনিবেশবাদের ইতিহাস ধরেই সম্পর্কগুলোকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বইয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। শুধু বলে রাখতে চাই 'উন্নয়ন' নিয়েও কোনো একটা ধারণাই চূড়ান্ত নয়। উন্নয়ন কেন? কোন পথে কার স্বার্থে—এই প্রশ্নগুলো জরুরি।

তার মানে আমরা যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে ওপর ওপর কিছু তথাকথিত তথ্য জেনে কিন্তু খুব কিছু বোঝা যায় না। কথার মানে, ধারণার মানে সব সময়ই খুঁজতে হয় আমাদের ইতিহাসে। কারণ, আজকে আমরা চারপাশে যা দেখছি, সেগুলো

Which side are you on, comrade, which side are you on?

পীট সীগার (আমেরিকার বিখ্যাত গায়ক)

লোভের, লাভের দুনিয়া চাও না সাম্যের বিশ্বায়ন? কোন দলে তুমি আছ বন্ধু, কী চায় তোমার মন?

সবই একটা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই মুহূর্তটাতে এসে পৌঁছেছে। বিশ্বায়নের আলোচনার আগে এত কথা বলছি বিশেষ কিছু কারণে। আমরা মনে করি এই বইটার গোড়ার কথাই হলো এই বিশেষ ধরনের বোঝার চেষ্টা। প্রথমত, আমরা বলতে চাই যে বিশ্বায়ন কথাটার বা ধারণাটার মানে খুঁজতে হলে আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতেই হবে। সেটাকে শুধু কোনো গাছ থেকে পড়া এখনকার, আজকের কাণ্ডকারখানা বলে পুরোপুরি বোঝা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়নের ইতিহাস উপনিবেশবাদের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের তাই এই ইতিহাসে ফিরে ফিরে যেতে হবে। তৃতীয়ত, উন্নত আর অনুন্নত এই ধারণাদুটোর আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কথার মানে প্রায় সব সময়ই বিতর্কিত। বিভিন্ন মানুষ বা দল নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথার মানে নিয়ে ঝগড়া করে, মানেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, বদলাবার চেষ্টা করে। কথার মানের একটা রাজনীতি থাকে। 'বিশ্বায়ন' কথাটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখব যে কথাটার মানে নিয়ে নানা মুনির নানা মত এবং তার পেছনে আসলে নানা স্বার্থ ও বোধ, অর্থাৎ রাজনীতি। আমাদের নিজেদেরও একটা বোধ, একটা রাজনীতি থাকা দরকার।

রাজনীতি বলতে আমরা কী বুঝি? তার সঙ্গে কথার মানের কী সম্পর্ক?

রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি সমাজের নানান দিকে নানান ক্ষমতা ও স্বার্থের সঙ্গে আমাদের মতামত ও কাজের সম্পর্কগুলোকে। আমরা রাজনীতিকে এই কারণে প্রায় সর্বব্যাপী হিসেবে দেখি। আমাদের মতে ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কগুলোকে আলাদা করে দেখা যায় না। আমার সামাজিক অবস্থান, আমার বোধ ও বিশ্বাস, এই সব মিলেই আমার রাজনীতিকে ঠিক করে দেয়। আমি কী করব, কী ভাবব, সেগুলোকে প্রভাবিত করে। যেমন, যদি আমি একটা ভালো কমপিউটার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র হই, আমার কলেজ থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত দেশে বিদেশে ভালো ভালো চাকরি পায়, আমি ভাবতে পারি যে বিশ্বায়ন খুব ভালো, আমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ খুলে দিচ্ছে। আবার বিশ্ব-স্তরে কোনো নতুন চুক্তির জন্য যদি আমার মালিকের ব্যবসা মার খায়, আমার চাকরি যায়, আমি ভাবব, বিশ্বায়ন খারাপ, আমার ভাত মারল। তার মানে আমার অবস্থান, অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশ্বায়নের মানে তৈরি করে দিল। আবার যদি আমি দেখি যে আমি চাকরি পেলেও অধিকাংশ মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, আমি নতুন করে ভাবতে পারি। এভাবে ক্রমাগতই একটা কথার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বদলাতে থাকে। অবশ্য সবসময়ই আমার সামাজিক অবস্থান আমার বোধকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না। তাহলে সব মধ্যবিত্তরাই একরকম ভাবত, সব গরিবদের চিন্তা এক হতো, সব বড়লোকরাও হুবহু এক মতামত পোষণ করত। মানুষের সামাজিক অবস্থানের পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষের নিজস্বভাবে মানে তৈরির ক্ষমতাকেও স্বীকার করা দরকার।

অনেক সময়েই আমরা যখন একটা প্রক্রিয়ার মাঝখানে থাকি, আমাদের মনে হয়, প্রক্রিয়াটা ঠিক যেন তক্ষুনি শুরু হলো, তার কোনো ইতিহাস নেই। আসলে তা নয়, সব প্রক্রিয়ারই একটা ইতিহাস থাকে, বিশ্বায়নেরও আছে। —স্টুয়ার্ট হল।

STUART HALL

বিশ্বায়নকে বুঝতে হলে

ইংরেজি ভাষায় 'গ্লোবাল' কথাটা প্রায় ৪০০ বছরের পুরোনো। গ্লোবালাইজেশন, যাকে বাংলায় আমরা বলি বিশ্বায়ন, কিন্তু চালু হয় অনেক পরে। ১৯৬০-এর দশকে এসে আমরা কথাটার প্রচলন দেখতে পাই। ১৯৯০-এর দশকে এসে বিশ্বায়ন আমাদের চারপাশের পরিবর্তনকে বোঝার ক্ষেত্রে বহু ব্যবহৃত একটা কথা হয়ে ওঠে। বিশ্বায়ন ঠিক কাকে বলে, বা কবে থেকে এর শুরু তা নিয়ে নানা মত আছে। আমরা একটা গ্রহে বাস করি, এ গ্রহকেই আমরা বিশ্ব বলে জানি। আমরা মানুষেরা এই গ্রহের প্রায় সব প্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছি। মেরু অঞ্চলগুলোর কিছু অংশ বাদ দিলে, বাকি গ্রহের প্রায় সর্বত্র আমরা নিয়মিতভাবে বাস করি, সেই অর্থে তো আমরা বিশ্বায়িত বটেই। বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক পুঁজির বিনিময়ও সুপ্রাচীন ঘটনা। এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ তো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনেই থেমে থাকেনি, এর মধ্যে দিয়ে গান-বাজনা, সাহিত্য, রান্নাবান্না আর খাবার অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারণা সব.

আদিবাসী কল্পনায় কচ্ছপের পিঠের ওপর পৃথিবী

কিছুই এক দেশ থেকে আর এক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে ক্রমশই যেন পৃথিবীটা ছোট হয়ে এসেছিল, বিভিন্ন দেশ, মানুষ, সংস্কৃতি ক্রমাগত পরস্পরের কাছে চলে এসেছিল। অনেকদিন আগে আমরা পৃথিবী সম্পর্কে যেভাবে ভাবতাম, তাতে বদল ঘটেছিল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে দেশে দেশে বা সমাজে সমাজে এই সম্পর্কগুলো নতুন মোড় নেয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে নৌশক্তি, রাজশক্তি, নাবিক ও বণিকদের যৌথ উদ্যমের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ড 'আবিষ্কৃত' হয়। এরই পাশাপাশি ইউরোপ থেকে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে পূর্ব আফ্রিকার ধার ঘেঁষে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছোনোর জন্য নৌপথও আবিষ্কার হয়। এই পথ খুলে যাওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যেমন বেড়ে যায়, এই বাণিজ্যে ইউরোপের রাজশক্তি ও বণিকশক্তির প্রভাবও তেমনই বাড়ে। নিজেদের দেশগুলোর সরকারের পূর্ণ সমর্থনে ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলো গড়ে ওঠে, পাশাপাশি অস্টেন্ড ও রয়্যাল আফ্রিকা কোম্পানিগুলোও তৈরি হয়। পঞ্চদশ শতক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস উপনিবেশবাদের ইতিহাস। এই উপনিবেশবাদের ইতিহাসের মধ্যে আজকের বিশ্বায়নের কিছু বৈশিষ্ট্যের খোঁজ পাওয়া যায়। কী এই বৈশিষ্ট্যগুলো?

বাণিজ্যিক আধিপত্য : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় দেশগুলোর উপনিবেশ 'আবিষ্কারে'র তাগিদের পেছনে মূল কারণ ছিল বাণিজ্য বাড়ানোর চেষ্টা। উপনিবেশবাদের ইতিহাস জুড়ে আমরা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে উপনিবেশগুলোর দখল নিয়ে যে কাড়াকাড়ি দেখি তার কারণও ছিল বিশ্ব-বাণিজ্যে আধিপত্য অর্জন করা ও কায়েম রাখা। নিজেদের মধ্যে উপনিবেশগুলোকে ভাগ করে নেওয়ার চিহ্ন অনেক প্রাক্তন উপনিবেশের শরীরে আজও দেখা যায়। আফ্রিকার ম্যাপ দেখো—অনেক দেশেই এই ভাগ যেন ছুরি দিয়ে মাংস কাটার মতোই পরিষ্কার।

এই দীর্ঘ সময় ধরে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে কাঁচামাল, যেমন কাঠ, কয়লা, তুলো, লোহা ইত্যাদি; দাস শ্রমিক বা চিনি, তামাক, কফির মতো খাদ্যপণ্য কম দামে ইউরোপে জোগান গেছে। উপনিবেশগুলোতে স্থানীয় চাষ ধ্বংস করে দিয়ে ঔপনিবেশিক প্রভু তার বাণিজ্যের প্রয়োজনে গায়ের জোরে কফি বা আফিমের চাষ করেছে। এইভাবে ইউরোপীয় দেশগুলো বিশ্ব-বাণিজ্য দখল করেছে, তাদের দেশে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান নৌ-বাণিজ্যের পথগুলো তারা দখলে রেখেছে, আবার এই বিশ্ব-বাণিজ্যে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বারবার নানান যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের কোলে ঝোল টেনে নানান চুক্তি তৈরি করেছে, এবং সেই চুক্তি রূপায়ণের নামে দুর্বল দেশগুলোকে গায়ের জোরে দমিয়ে রেখেছে। আজকের বিশ্বায়নকে বুঝতে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই দেখি যার সঙ্গে এই উপনিবেশবাদের ইতিহাসের আশ্চর্য মিল। তার মানে এই নয় যে বিশ্বায়ন সরাসরি ভাবেই উপনিবেশবাদের আজকের রূপ, কিন্তু মিলগুলো লক্ষ করা অবশ্যই দরকার।

রাজনৈতিক আধিপত্য : ইউরোপের দেশগুলো যখন তাদের বাণিজ্যের স্বার্থে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল, তখন একটা স্তরে তারা টের পেল যে নিরঙ্কুশ বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই দেশের শাসনক্ষমতাকেই পুরোপুরি দখল করা দরকার। এর ফলে ছলে বলে কৌশলে তারা উপনিবেশগুলোর শাসনক্ষমতা দখল করে নিল। আমাদের দেশ যেমন শেষ পর্যন্ত মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে যায়।

উপনিবেশবাদের মধ্যে দিয়ে যেটা ঘটে সেটা হলো গত ৫০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলাপ আলোচনা, দর কষাকষি যেন ইউরোপের

দেশগুলোর একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে দেশগুলোতে বাস করে তাদের এ ব্যাপারে খুব একটা ভূমিকা থাকে না। উপনিবেশবাদ গেড়ে বসার আগে ইউরোপের বণিকশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তিগুলো এশিয়া বা আফ্রিকার বড় শক্তিগুলোকে সমঝে চলতে বাধ্য ছিল, একজন দিল্লির বাদশাহ বা চীনের সম্রাট তাদের ধমকি দিতে পারতেন, বাণিজ্যের অধিকার নাকচ করে দিতে পারতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে হয় এঁরা পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত হলেন, নয় একেবারে পুতুল হয়ে গেলেন, ইউরোপীয় শক্তিগুলো পুরো পৃথিবীটাকেই নিজেদের মধ্যে বেঁটে ভাগ করে নিয়ে নিল। তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ পৃথিবীর বাকি সব মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ প্রভুর সাম্রাজ্য বাঁচানো বা বিস্তারের জন্য আমাদের দেশের সৈন্যরা হাজারে হাজারে প্রাণ দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর পক্ষে এই উপনিবেশগুলোকে দখলে রাখা আর সম্ভব হচ্ছিল না। একদিকে যুদ্ধে তাদের নিজেদের কাঠামো ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল, প্রচুর সম্পত্তি, কলকারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার অন্যদিকে উপনিবেশগুলোতে খুব জোরদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই উভয় সঙ্কটে পড়ে উপনিবেশগুলো ছেড়ে চলে আসা ছাড়া খুব একটা গত্যন্তর তাদের ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসা বেসামাল ইউরোপ ও পৃথিবীকে সামলাতে নতুন করে বিশ্ব সংগঠনের কথা ভাবা হলো, বিজয়ী মিত্রশক্তির নেতৃত্বে তৈরি হলো রাষ্ট্রসংঘ। মজার কথা এই, তাতেও কিন্তু দাদা থেকে গেলেন সেই ইউরোপের দেশগুলোই আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ার নতুন অবিসংবাদিত মহাশক্তি ইউ এস এ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

উপনিবেশের উলটপুরাণ: রাজশক্তির হাতবদল
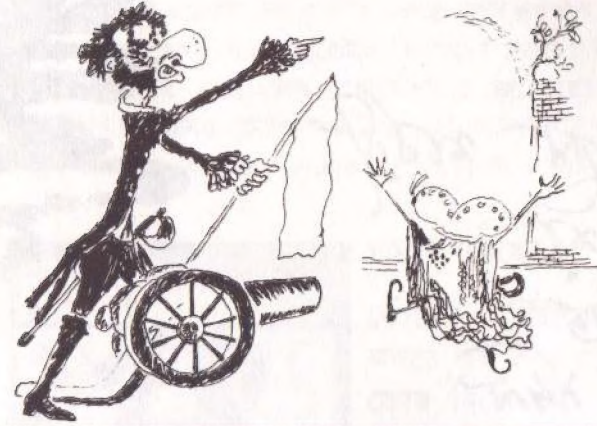
পোহালে শর্বরী
বণিকের
মানদণ্ড
দেখা দিল
রাজদণ্ড রূপে।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য : এ পর্যন্ত এসে কারো মনে হতেই পারে এই যে এতবড় কাণ্ডটা ঘটে গেল, ছোট্ট কয়েকটা দেশ পৃথিবীর এতবড় একটা ভূখণ্ডকে দখল করে নিজেদের ইচ্ছেমতো ভোগদখল করল, পুরোটাই কি গায়ের জোরে? উত্তরে বলতেই হয়, অনেকটাই গায়ের জোরে হলেও পুরোটাই গায়ের জোরে নয়। এই প্রসঙ্গে ইতালির কমিউনিস্ট আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্ব নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। তাঁর জেলে বসে লেখা বই *প্রিজন্ নোটবুকস* পৃথিবী বিখ্যাত একটা কাজ।
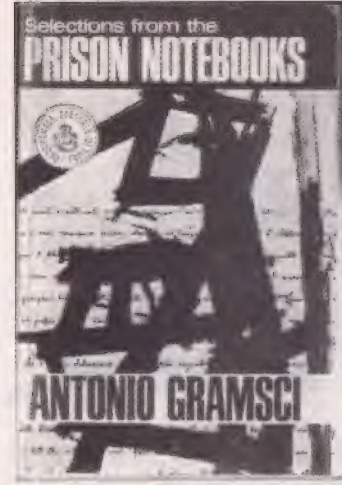
গ্রামশি বলেছেন :

কোনো সমাজকে যদি শাসন করতে হয় তবে সেটা শুধু গায়ের জোর দিয়ে করা সম্ভব নয়। যে শাসন করবে তাকে যাদের সে শাসন করবে সেই মানুষদের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে হবে। এই সম্মতি ছাড়া শুধু গায়ের জোরে শাসন করা যায় না। এই সম্মতি নির্মাণকে আমি বলি হেজিমনি।

উপনিবেশবাদী শক্তিগুলো তাদের শাসনের সমর্থনে সম্মতি নির্মাণের এক বিশাল আয়োজন করেছিল। তাদের শাসনকে পৃথিবী জুড়ে সভ্যতার বিস্তার বলে প্রচার করেছিল। এই কাজে তারা ব্যবহার করেছিল তাদের তৈরি আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ইত্যাদিকে। এই ইউরোপীয় প্রচারের অনেকগুলো দিক ছিল। ধর্মীয় প্রচারে খ্রিস্টধর্মকে প্রচারের চেষ্টায় দেশে দেশে ধর্মযাজকরা ছড়িয়ে পড়লেন। বলা হলো বহু দেবতার পুজো করা কুসংস্কারের লক্ষণ, অসভ্যতার লক্ষণ; ইউরোপের উন্নতির কারণ প্রভু যিশুর একক মাহাত্ম্য মেনে নেওয়া, উপনিবেশের 'অসভ্যদেরও' তাই করা উচিত। আমাদের মতো দেশের নানা লোকাচার, পুজো আর্চা ইত্যাদি ইউরোপীয় গবেষকদের চোখে আমাদের 'পিছিয়ে পড়া' সংস্কৃতির লক্ষণ বলে গণ্য হলো। বলা হলো উন্নত আলোকপ্রাপ্ত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে এগুলো একেবারেই উপযুক্ত নয়। আমাদের মতো দেশের সমাজব্যবস্থা যে কতটা 'পিছিয়ে পড়া' তা প্রমাণ করার জন্য এঁরা বিশেষ করে বেছে নিলেন মেয়েদের অবস্থানকে। সতীদাহ, বিধবাদের সামাজিক দুর্দশা,

বহুবিবাহ ইত্যাদিকে তুলে ধরা হলো বিশ্বের সামনে আমাদের অসভ্যতা প্রমাণ করার জন্য। এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথাই বলা যে যারা মেয়েদের ওপরে এত অত্যাচার করে তারা সভ্যভাবে দেশ চালাতে অনুপযুক্ত, অতএব সভ্যতার খাতিরেই এ দেশের ভার শিক্ষিত ঔপনিবেশিক শাসককে নিতেই হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে, ঠিকই তো, সতীদাহ, বহুবিবাহ বন্ধ হওয়াই উচিত, বিধবা বিবাহ চালু হওয়া প্রয়োজন, ওঁরা তো ঠিক কথাই বলেছিলেন। এ কথা নিয়ে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই। আমাদের প্রশ্নটা অন্য—যে বিদেশি শাসকরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাস বানাতে পারে, যারা সেই দাসদের গাছে ঝুলিয়ে পুড়িয়ে মারতে পারে, যারা ম্যালেরিয়ায় গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে গেলে তোয়াক্কা করে না, যারা মন্বন্তর তৈরি করে নিজেদের স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছিল, তারা হঠাৎ কোনো ভারতীয় মেয়ে সতী হলে এত কেঁদে উঠছিল কেন? অর্থাৎ সতীদের প্রতি এই দরদটা কতটা খাঁটি? না কি এটা ক্ষমতা দখলের জন্য একটা অজুহাতের বেশি কিছু নয়?

শুধু আমাদের সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতিই নয়, এই শাসকেরা বলেছিলেন যে আমাদের অসভ্য না হয়ে কোনো উপায় নেই কারণ এই অসভ্যতা আমাদের হাড়ে-মজ্জায়,

আমাদের গঠনে। এই 'প্রমাণ' খোঁজার কাজে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞানকে সরাসরিভাবে ব্যবহার করেছিলেন। আমাদের দেশে ঠগী বলে এক ধরনের পথ-ডাকাতদের কথা হয়তো আমরা অনেকেই জানি। কয়েকজন ঠগীর ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর তাদের খুলিগুলো বিলেতে পাঠানো হয়েছিল গবেষণার জন্য, সেখানে 'পণ্ডিতরা' নানা মাপ জোক করে নাকি বুঝেছিলেন যে এদের মস্তিষ্কের গঠনই এদের অপরাধপ্রবণ করে তোলে!! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলো 'হটেনটট ভিনাস'-এর ঘটনা। এই মহিলাকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 'সংগ্রহ' করে নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় লন্ডন, ফ্রান্স সহ বিভিন্ন

শহরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বেড়ানো হয়, উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে আফ্রিকার মেয়েদের শরীর কীরকম আলাদা, পশুর মতো হয়। এরা ঠিক মানুষ নয়। এই হলো সভ্যতার ইতিহাস। কারণ যার ওপর অত্যাচার করব, সে আমার চেয়ে অধম এটা না প্রমাণ করলে তো এইভাবে মানুষকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না।

ব্রিটিশরা লোধা শবরদেরও 'অপরাধপ্রবণ' বলে চিহ্নিত করেছিল। যদিও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৫০-এর দশকে সরকারিভাবে লোধাদের বিমুক্ত ঘোষণা করা হয়, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে এঁদের প্রতি সন্দেহ থেকেই যায়। চুনি কোটাল যখন লোধাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক হন তখন অনেক খবরেরকাগজই লেখে যে চুনি 'অপরাধপ্রবণ' লোধা আদিবাসীদের মধ্যে প্রথম স্নাতক।

আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে এ কথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর এই যে সম্মতি নির্মাণের প্রয়াস, এ বহুলাংশে সফল হয়েছিল এবং এর জের সরাসরি উপনিবেশের ইতিহাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, মানে যাকে আমরা বলি 'উত্তর-উপনিবেশ' যুগ, সেই যুগে বসেও টের পাচ্ছি। মেনে নেওয়াই ভালো যে উপনিবেশগুলোর স্থানীয় মানুষদেরও বহুলাংশ এই বিদেশি শাসনকে উন্নত এবং নিজেদের অনুন্নত বলে ভাবতে শিখেছিলেন, এবং আজও ভাবেন।

ইতিহাস পড়লেই জানা যায় যে ইংল্যান্ড আমাদের দেশ লুঠ করে ধনী হয়েছিল, আমাদের শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, আমাদের কৃষকদের সর্বনাশ করেছিল, তবু বহু ভারতীয়ই আজও মনে করেন যে ইংরেজ আমাদের উপকার করেছে।

শত শত বছর ধরে অনেক বেশি সাদা মানুষেরা কালো মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে, তবু অনেক কালো মানুষই মনে করেন, সাদারা আমাদের চেয়ে বেশি সভ্য!!

আমরা নেটিভ আমেরিকানরা অবশ্য খুব বেশি বেঁচে নেই, আমাদের মোটামুটি শেষ করে দিয়েছে, আমাদের সম্মতির ধার ধারেনি।

আমাদের তেলের লোভে আমাদের অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইউরোপীয় ও আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তিগুলো আর বহুজাতিক সংস্থাগুলো আমাদের শোষণ করেই চলেছে, তবু বহু আরবই মনে করেন ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চেয়ে উন্নত।

মানবতাবাদ, ধনতন্ত্র ও আধুনিকতা

৫০০-৬০০ বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে চিন্তার জগতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। এই চিন্তার আন্দোলনকে আমরা রেনেসাঁস বলে জানি। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা দেখব যে এর মূল কথা ছিল দৈব নির্ভর একটা পৃথিবী থেকে সরে এসে বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে ব্যক্তি-মানুষকে চিহ্নিত করা। এই মানবতাবাদ বা ব্যক্তি-মানুষের জয়গান—যাকে আধুনিকতার সূচনা বলে ভাবা হয়—তার সঙ্গে কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মধ্যযুগের সামাজিক কাঠামোটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ও কৃষিনির্ভর। সেখানে মানুষের স্থান ছিল জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট। রেনেসাঁস বা আধুনিকতার প্রথম যুগে এই কাঠামোটার আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। কৃষিনির্ভরতা থেকে বাণিজ্যিক পুঁজি বাড়ানোর উপর ঝোঁক পড়ে; সামন্ততন্ত্র থেকে রাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যায় রাষ্ট্র এবং এ সব কিছুর কেন্দ্রে থাকে ব্যক্তি-মানুষ, যে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভার জোরে সম্পদ বৃদ্ধি করে নিজের অবস্থান ও অবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

এই সময় ইউরোপে ধনতন্ত্রের বিকাশভিত্তিক যে গতির সৃষ্টি হয়, সেটাই হয়ে ওঠে সভ্যতা, প্রগতি, আধুনিকতার সংজ্ঞা, উন্নতির মাত্রা। আমাদের মতো দেশেও যখন এই ইউরোপীয় চিন্তাধারা এসে পৌঁছোয় তখন আমাদের সমাজের যে অংশ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন, তাঁদের মধ্যে ইউরোপীয় পথে শিল্প বিকাশ ও বাণিজ্য বিকাশ ঘটিয়ে দেশের অগ্রগতি ঘটানোর পক্ষে একটা জোরদার সম্মতি তৈরি হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে ইউরোপীয় মানবতাবাদের ধারণা কখনোই সব মানুষকে নিয়ে নয়। মূলত সাদা, শিক্ষিত, পুরুষমানুষই এর কেন্দ্রে। এই মানবতাবাদের ধারণা কত দূর আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছেছিল তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে যেটা অবশ্যই পৌঁছেছিল সেটা হলো ধনতন্ত্র। উপনিবেশবাদের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগে আমাদের দেশেও যন্ত্রশিল্পের বিস্তার শুরু হয়েছিল। বড় বড় শহরে কলকারখানা তৈরি হয়েছিল। এইসব পরিবর্তন উপার্জনের সহায় হিসেবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের মনে একটা নতুন আশা জাগিয়েছিল।

বিশ্বায়নের পথে আমরা

আমাদের মতো উপনিবেশগুলো যখন স্বাধীন হলো তখন তাদের সামনে অনেকগুলো সমস্যা ছিল। উত্তর-উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর দায়দায়িত্ব ছিল প্রচুর। ঔপনিবেশিক লুঠের জন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক ক্ষেত্রেই কমে এসেছিল, এই দেশগুলোর আদি উৎপাদন ব্যবস্থাগুলো ধ্বংস হয়ে ইউরোপীয় যন্ত্রসভ্যতার মডেলে শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যার জন্য এই দেশগুলো ভীষণভাবেই পশ্চিমের ওপর নির্ভরশীল থেকে গিয়েছিল। বিশ্ব-বাণিজ্যের দখল সুনিশ্চিতভাবে ইউরোপ আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে সেখানেও খুব সুবিধে হচ্ছিল না। অনেকের মতে উপনিবেশ ছাড়ার আগে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিশ্চিত করে নিয়েছিল যে স্বাধীনতার পরও প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে উন্নত দেশগুলোর যুদ্ধে ধ্বসে যাওয়া অর্থনীতিগুলোকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে ইউরোপ ও আমেরিকা আদাজল খেয়ে লেগেছিল। এর মধ্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক আবহাওয়ায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে মার্কসবাদ এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উপস্থিতি, উপনিবেশগুলোতে জোরদার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এবং বহু উপনিবেশেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব, সব মিলিয়ে কেবল উন্নত দুনিয়াকে নিয়ে ভাবা সম্ভব ছিল না। আগের মতো উপনিবেশগুলোকে সরাসরি আর খোলাখুলি অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে নিজেদের সম্পদ বাড়ানোও সম্ভব ছিল না। কাজেই নিজেদের কোলে ঝোল টানলেও, অন্তত মুখে—যা হচ্ছে, সবার ভালোর জন্যই হচ্ছে, এরকম একটা ভাব রাখা দরকার হয়ে পড়েছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উত্তর-উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলোর সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল উপনিবেশবাদী প্রভুদের দখল করা ভূখণ্ড ধরে, কখনো বা তারই মধ্যে ধর্ম অনুযায়ী ভাগও করে

দেওয়া হয়েছিল, যেমন ভারত-পাকিস্তান। আবার আফ্রিকার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ করে দেখতে পাই একটাই বড় জনগোষ্ঠী উপনিবেশের ভাগ অনুযায়ী নানা রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেছে। এই নানান জোড়াতালি, বিভাজনের ফলে এই নতুন রাষ্ট্রগুলোর জাতিপরিচয় নিয়ে নানা সমস্যা থেকেই গেল। যে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব এই দেশগুলোর দায়িত্বে এলো তাদের চরিত্র নিয়েও সমস্যা থেকে গেল। এই সময় সমাজতন্ত্র একটা জোরদার মতবাদ হয়ে দাঁড়ানোয় এই রাষ্ট্রেরা অনেকেই সমাজতন্ত্রের পথ নেবে বলে ঘোষণা করেছিল। আমাদের দেশেও যেমন বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের হয়ে শিল্প-বাণিজ্যের দায়িত্ব নেবে এবং এর থেকে উদ্ভূত লাভ সমাজের সবার কাছে পৌঁছোবে। জওহরলাল নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক থেকে ইন্দিরা গান্ধির ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, কয়লা খনি জাতীয়করণ পর্যন্ত এই মতবাদের পরিচয় আমরা পাই। এই সময় রাষ্ট্র একটা সামাজিক ভূমিকা পালন করবে বলে ভাবা হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়া থেকে প্রায় ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত এই সমাজবাদী প্রভাবের যুগ বলে ধরে নেওয়া যায়।

১৯৭০-এর দশকে এসে আস্তে আস্তে ছবিটা কীরকম বদলে যেতে লাগল। উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলোতে রাষ্ট্রগুলো কিছুই করতে পারল না বলা ঠিক নয়, তবে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মেটানোর থেকে অনেক দূরেই থেকে গেল। অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর ওপর সে দেশের বড় শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের প্রভাব ছিল। দেখা গেল স্বাধীনতার পরেও তাদের স্বার্থই ফুলে ফেঁপে উঠছে। অনেক দেশেই আবার যে এলাকার রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রে ক্ষমতায় বেশি জোর, তাদের অঞ্চলেই উন্নয়ন সীমাবদ্ধ থেকে গেল, অন্য এলাকায় পৌঁছোল না। ভারতের বহু অংশের মানুষই মনে করেন যে রাষ্ট্রের সুবিধে দিল্লি আর তার আশেপাশের মানুষই বেশি পেয়েছেন, সর্বত্র পৌঁছোয়নি। রাষ্ট্র দুর্বল হওয়ায় নানান ধর্ম, ভাষা,
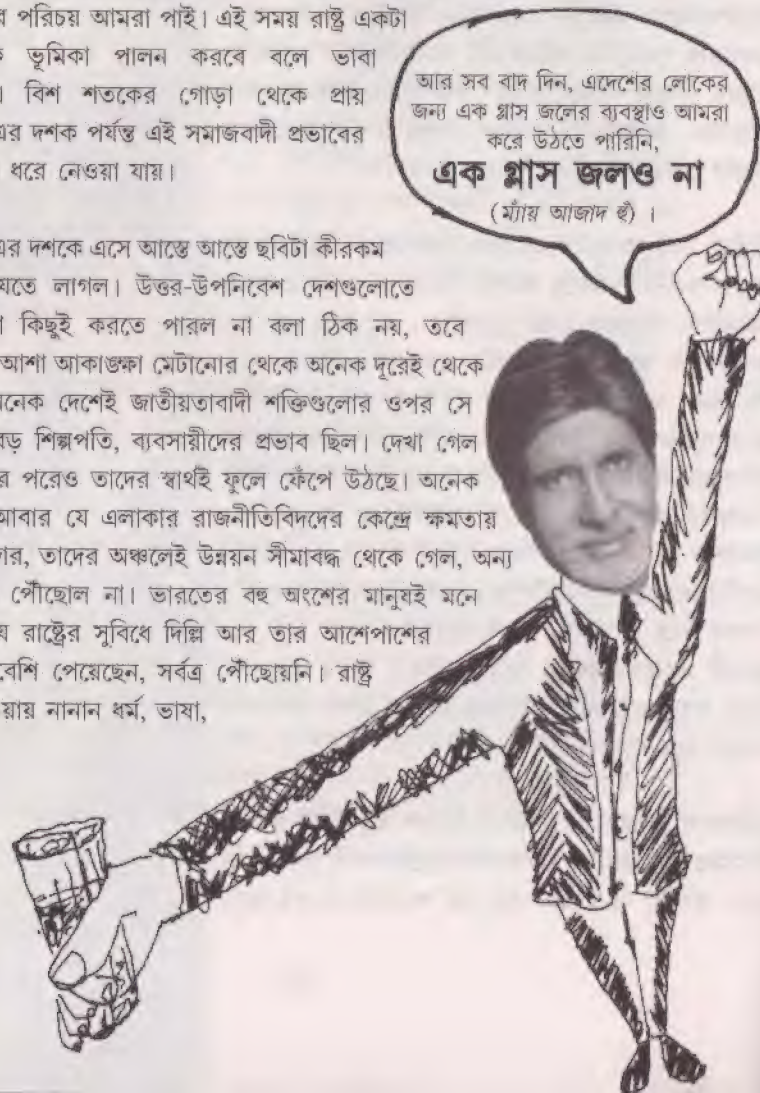
বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ ও গ্যাট কী?

বিশ্বব্যাঙ্ক (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক)

দি ইন্টারন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফ-এর সঙ্গে একসঙ্গে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে—আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসে সংগঠিত ইউনাইটেড নেশনস মনিটরি অ্যান্ড ফাইনানশিয়াল কনফারেন্সে। এই দুটি সংস্থাকে তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব নিয়ে এসে বিশ্ব বাণিজ্যকে বাড়ানো। বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হতে হলে আই এম এফ-এর সদস্য হতে হয়। বিশ্বব্যাঙ্ক সাধারণ অর্থে ব্যাঙ্ক নয়। এটা রাষ্ট্রপুঞ্জের একটা বিশেষ সংস্থা, ১৮৪টি দেশ এর সদস্য। নিয়ম অনুযায়ী এই সংস্থা কীভাবে টাকা আয় এবং ব্যয় করবে তার সব সিদ্ধান্ত সদস্যদের নেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, কার্যত শক্তিশালী দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা, নানা বিষয়ে দাদাগিরি করেই থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক দীর্ঘকালীন কম সুদের ঋণ দেয়, সুদ ছাড়া ধার দেয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনুদানও দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাঙ্কের খাতায় কলমে উদ্দেশ্য হলো ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমানো, এবং ধনী দেশগুলোর সম্পদ-সাহায্য ব্যবহার করে গরিব দেশগুলোকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস এর ঠিক উল্টো অভিজ্ঞতার কথাই বলে।

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ)

আই এম এফ বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গেই ১৯৪৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এরও সদস্য ১৮৪টি দেশ। আই এম এফ-এর উদ্দেশ্য হলো মুদ্রা বিনিময়ের হারের দিকে লক্ষ রাখা, কোনো দেশের বিদেশি মুদ্রা কম পড়লে তাকে আই এম এফ শর্ত সাপেক্ষে এই মুদ্রা ধার দেয়। আই এম এফ বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করারও একটা মঞ্চ, সদস্য দেশগুলোকে এই সংস্থা কারিগরি সাহায্যও দিয়ে থাকে। কোনো দেশকে সাহায্য করার সময় আই এম এফ যে শর্তগুলো চাপায় তার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের তুলনায় আই এম এফ বেশি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠান।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বোর্ড অফ এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরদের ভোটের মধ্যে দিয়ে। এই ডিরেক্টররা সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন। এখন ভোটাধিকার ঠিক হয় একটা দেশ কতটা টাকা দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একারই আছে ১৭ শতাংশ ভোট। উল্টোদিকে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ঐতিহ্য অনুসারে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হন একজন আমেরিকান, এবং আই এম এফ-এর প্রেসিডেন্ট একজন ইউরোপিয়ান।

গরিব দেশগুলোতে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদানের ফলে আমেরিকার বা উন্নত দুনিয়ার বাণিজ্য সংস্থাগুলোর লাভ হয় কীভাবে?

বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় এই দেশগুলোতে যে প্রকল্পগুলো চালু হয়, তাতে উন্নত দেশে তৈরি হয় এমন মালমশলা, যন্ত্রপাতি বা পেশাদারদের পরামর্শ ইত্যাদি কিনতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে এই টাকা ধনী দেশগুলোতেই ফিরে আসে। খোদ মার্কিন ট্রেজারি দফতরই হিসেব করে দেখিয়েছে যে উন্নয়নের খাতে আমেরিকার সরকার বিশ্বব্যাঙ্কে বা অন্য কোনো উন্নয়নের ব্যাঙ্কে ১ ডলার দান করলে, ২ ডলার ঐ ব্যাঙ্কের দেওয়া ব্যবসার বরাত থেকে পাওয়া লাভ হিসেবে ঘরে ফিরে আসে। এই স্বার্থের কারণে, ব্যাঙ্ক বড় বড় প্রকল্পে সাহায্য করার চেষ্টা করে, যাতে যন্ত্র, কারিগরিবুদ্ধি ইত্যাদি বেচে লাভটা বড়লোক দেশের ঘরে ওঠে। ছোটখাটো স্থানীয় প্রকল্প তেমন আমল পায় না।

গ্যাট

দ্য জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ্স্ অ্যান্ড ট্রেড (সংক্ষেপে গ্যাট) সদস্য দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের নিয়মকানুন সম্পর্কিত একটি চুক্তি। সুইটজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৯৪৭ সালে ২৩টি দেশ এই চুক্তি সই করেছিল। গ্যাট সেই অর্থে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা ছিল না, যদিও প্রথম থেকেই একটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। গ্যাট চুক্তিতে বহুবার অদল বদল হয়েছে, এগুলোর মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো ১৯৯৪ সালের মারাকেশ চুক্তি, এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে উরুগুয়েতে শুরু হওয়া আলাপ আলোচনার স্তরের সমাপ্তি ঘটে, এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের জন্ম হয়।

আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম

আঞ্চলিকতাভিত্তিক উপ-জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সমস্যা সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই দেশগুলো পিছিয়েই থাকল। ফলে মনে হতে লাগল এই সমাজবাদও একটা ভাঁওতা, এতে ক্ষমতায় থাকা নেতা ও চামচাদের সুবিধা হয়, বাকিদের কিছু হয় না।

এর পাশাপাশি সমাজবাদী দেশগুলোর ভেতর থেকেও নানা খবর এসে পৌঁছোতে লাগল। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্তালিন আমলে ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী আমরা শুনলাম, সেগুলোকে প্রয়োজনীয় লাল সন্ত্রাস বলে ঢেকে রাখা গেল না। চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে নৃশংস তাণ্ডবও আমাদের ভাবিয়ে তুলল। বলা বাহুল্য, ধনতান্ত্রিক প্রচারযন্ত্র সমাজতন্ত্রের এই ব্যর্থতাকে ফলাও করে প্রচার করতে লাগল। এই সময় জুড়ে ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক দাদা আমেরিকা পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছিল, তার মূল লক্ষ্য অবশ্যই ছিল কমিউনিস্টরা। ইন্দোনেশিয়ায়, চিলিতে গণহত্যা, ভিয়েতনামে আক্রমণ—সেই উপলক্ষে পাশের দেশগুলোকেও বোমা মেরে বিধ্বস্ত করে দেওয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব দুনিয়া জুড়ে একটার পর একটা দেশে গণতান্ত্রিক সরকারকে ফেলে দিয়ে গুন্ডা জুনটা রাজ কায়েম করা, মানে গুণের আর শেষ নেই।

নুন খাও কী ঝাল খাও কী টক মিষ্টি খাও
চায়ের কাপে ক চামচ চিনি তুমি দাও।
পেট ভরে খাও কী থাকো পেটেতে কিল মারিয়া
সব জানতে পারবে সিয়ার কাছে সিয়া সিয়া সিয়া।

চেতনার 'মারীচ সংবাদ' থেকে সিয়ার গানের কথা।

কিন্তু এইসব কথা সক্রিয় বাম আন্দোলনে যুক্ত না থাকলে জানবার তেমন উপায় ছিল না। অবশ্য পশ্চিম বাংলায় বসে আমরা এটা ঠিক বুঝতে পারব না, কারণ একটা শক্তিশালী বাম সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমাদের এই সন্ত্রাসের সঙ্গে পরিচিত রেখেছিল।

সমাজবাদবিরোধী প্রচারের পাশাপাশি আরো একটা জিনিস ঘটছিল যেটা বিশ্ব জুড়ে ধনতন্ত্রের সপক্ষে যাচ্ছিল। বাজারে নানান জিনিস পেয়ে যাওয়াটা সব সময় শিল্প সভ্যতার পক্ষে কাজ করে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাজার নানান জিনিসে ছেয়ে যায়। বাজারের বিকাশের ফলে জাতপাত নির্বিশেষে মানুষ কিছুটা ভোগের অধিকার পায়। পুরসভার সাফাই কর্মীর গায়েও 'নাইকে' লেখা নকল টি-শার্ট ওঠে। এই যে ভোগের অধিকারের এক ধরনের গণতান্ত্রিক ভূমিকা—এটাও আমাদের বোঝা দরকার।

বাজারের পথে মধ্যবিত্ত : আমাদের দেশের মতো প্রাক্তন উপনিবেশগুলোতে অধিকাংশ লোকের জীবনে তেমন পরিবর্তন না এলেও সংগঠিত শিল্প, সরকারি চাকুরি, মধ্যস্তরের ব্যবসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটা বড় সংখ্যার নাগরিক সমাজ তৈরি হয়েছিল। ১৯৫০-৬০-এর দশকেই এদের অস্তিত্ব আমরা টের পাচ্ছিলাম, ১৯৮০-র দশকে এসে এরা একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীর উত্থানের কারণ কিন্তু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা, এঁরাই সেই শ্রেণী যাঁরা স্বাধীনতার পরে শিক্ষা চাকরি ইত্যাদি সবরকম সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু ১৯৮০-র দশকে আমরা দেখলাম এঁরাই রাষ্ট্রের সবরকম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি সরব। এই সুবিধাভোগীরা নিজেরা রাষ্ট্রের নানা সুবিধে পাওয়ার দিকটাকে বেমালুম অস্বীকার করে এমন একটা ভাব করলেন যেন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলেই তাঁরা খুব খারাপ আছেন। এঁদের দাবি, রাষ্ট্র সবরকম নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দিক, সবরকমের অবাধ পণ্যের বাজার চালু হোক। দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হলেও এই ক্রেতা নাগরিক শ্রেণী বিশ্ব বাজারে যোগদানের পক্ষে জোরালো চাপ সৃষ্টি করেছিল।

আমরা জানি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকা খুবই সফলভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বাজার তৈরির পথে এগিয়েছিল। ১৯৪৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস-এর বৈঠক থেকে উঠে আসা বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ্স্ অ্যান্ড ট্রেড সুসংগঠিতভাবে ঈপ্সিত ফল দিচ্ছিল। মনে রাখতে হবে যে অর্থনৈতিক আধিপত্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক আধিপত্যেও এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৮০-র দশকে মার্কিন জোট একটা বিরাট জয়লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ভেতর আর বাইরের চাপের মুখে ভেঙে যায়, ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ হয়, গোটা পৃথিবীতে আমেরিকার প্রাধান্য চ্যালেঞ্জ করার মতো বড় কোনো শক্তি আর থাকে না। চীন তার

মণ্ডল কমিশন

১৯৮০-র দশকে মণ্ডল কমিশন বিরোধী আন্দোলনে আমরা এই ক্রেতা নাগরিকদের চরিত্রটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। মণ্ডল কমিশন সুপারিশ করেছিল চাকরির ক্ষেত্রে অনুন্নত জাতি ও শ্রেণীর মানুষদের জন্য সংরক্ষণ চালু রাখা হোক। এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিল উচ্চ বর্ণের ও শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা। এমনই উন্মাদনা যে নিজেদের গায়ে আগুনও দিয়েছিল কেউ কেউ। বাম ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্ররা মুচি সেজে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এঁদের বক্তব্য ছিল যে এই সংরক্ষণ থাকলে ছোট জাতরাই সব চাকরি পেয়ে যাবে, মেধাবী হয়ে কোনো লাভ থাকবে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তিটা তো ঠিকই, কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেই তো সবাই সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ওঠা মানে কি সব নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়া? না কি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ জাতপাতের বৈষম্য, ধনীগরিবের বৈষম্যের মধ্যে যেটুকুও ভারসাম্য আনবার চেষ্টা করছে, সেটুকুও সহ্য করা যাচ্ছে না? আমরা কী দেখি? সমাজে উচ্চশিক্ষা, চাকরি, ব্যবসার সুযোগ কারা বেশি পায়? ছোট জাতের গরিব মানুষেরা কি? এই মেধা-ভিত্তিক সমাজের দাবি তো আসলে এই অসম ব্যবস্থা চালু রাখারই দাবি, তাই না?

মেধা আর মেয়েদের গল্প

গ্রামের নাম নূরপুর। স্কুলে মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়তে পারবে। সরকার ১০টা আসন মেয়েদের জন্য রাখলেন। ছেলেরা বলল যে এর ফলে কম মেধার মেয়েরা বেশি মেধার ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হোক। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে ভর্তি পরীক্ষার নম্বর দেখে ভর্তি করা হোক। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা ঠিক। কিন্তু প্রশ্নটা হলো মেয়েরা তো এমনিতেই পড়তে আসতে পারে না, সমাজ মনে করে তাদের পড়ার দরকার নেই। বাড়িতে মাকে সাহায্য করে, মাঠে কাজ করে, বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি বয়স হলেই বাড়ি থেকে বেরোনো মানা হয়ে যায়। তাহলে ঐ সংরক্ষণ তুলে দিলে এই দেশে মেয়েরা কোনোদিন সমান সুযোগ পাবে কি?

নিজের ঘর সামলাতে আর বিশ্ব বাজারে অংশ নিয়ে নিজের ১০০ কোটিরও বেশি মুখে ভাত জোগাতেই ব্যস্ত থেকে যায়। এর পাশাপাশি ধনতন্ত্রের শক্তিগুলোর মধ্যেও বাজার দখলের লড়াই পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় সামলে উঠে জাপান বিশ্ব বাজারে এক বড় খেলোয়াড় হিসেবে দেখা দেয় এবং শস্তায় বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে আমেরিকার নিজের বাজারই দখল করতে শুরু করে। প্রতিযোগিতার ফলে অতি উৎপাদন ঘটে, চাহিদা বাড়ে না এবং মন্দা দেখা দেয়। ফলে প্রয়োজন হয়ে ওঠে বিশ্ব জুড়ে আরো সংগঠিতভাবে বাজার তৈরি করার কাজে নেমে পড়া। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরিও তৈরি হয়। ইন্টারনেট ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিমেষে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শুধু যোগাযোগ করা যায় তাই নয়, মিলিয়ন কী বিলিয়ন ডলার চালাচালি করাও সম্ভব হয়ে ওঠে। দ্রুতগতির বিমান যোগাযোগ, টেলিকমিউনিকেশনস, ইন্টারনেট, এসবের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে বিশ্বজোড়া বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধের কারণ থাকে না। আর এইসব মিলে আমরা দেখতে পাই, ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য দুনিয়া জুড়ে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ, যাকে আমরা বিশ্বায়ন বলে জানি।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন

১৯৮০-র দশকে ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলো বিশ্ব জুড়ে সংগঠন গড়ে তুলে বাজারকে ছড়িয়ে দিয়ে লাভ বাড়ানোর জন্য প্রায় মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফল হিসেবে ধীরে ধীরে আমরা অনেকগুলো নতুন নতুন প্রক্রিয়া, ঝোঁক এবং ফলাফল দেখতে পাই। ধনতন্ত্রের আসল লক্ষ্য ছিল নানান দেশের নানান অর্থনীতিকে একটা আন্তর্জাতিক খোলা বাজারে এনে ফেলা। এর জন্যে কয়েকটা কাজ করা জরুরি ছিল:

● বিভিন্ন দেশে স্থানীয় প্রয়োজনের জন্য জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন করার চেয়ে বিশ্ব বাজারের জন্য জিনিস বা পরিষেবা উৎপাদন করাটা বেশি লোভনীয়, সে কথা সে দেশের সরকার এবং উদ্যোগপতিদের ছলে, কৌশলে এবং বলের মাধ্যমে বোঝানো।

● কারিগরি কুশলতা, পুঁজি, কিছুটা বাজারের খোঁজ ধার দিয়ে দেশগুলোকে এই বিশ্ব-বাণিজ্যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং শস্তা জোগানদার হিসেবে হলেও অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরি করা (বলা বাহুল্য, এই দেশগুলোর স্বার্থে নয়)।

● বিভিন্ন দেশের নানান ইতিহাস থেকে উঠে আসা রাষ্ট্রগুলো অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের অর্থনীতি নিয়ে সংরক্ষণশীল ছিল। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের প্রভাবের ফলে অনেক দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর রাষ্ট্রের আরোপিত কড়াকড়ি ছিল। সেই দেশের অর্থনীতিতে যাতে বিদেশি পুঁজি বা বাজার বেশি প্রভাব ফেলতে না পারে সেইজন্য কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল। ধনতন্ত্রের কাজ হলো এক এক করে এই কবচগুলোকে খুলে ফেলে সেই দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব বাজারের টানাপোড়েনের কাছে পুরোপুরি খুলে দেওয়া।

এই কাজগুলো করার জন্য কিছু সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া হলো :

■ সরকারগুলোকে চাপ দিয়ে একটা দেশের বাজারে বিশ্বপুঁজি, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অবাধ যাতায়াত সুনিশ্চিত করা হলো। এর ফলে আমরা দেখছি আমাদের দেশের সংস্থা মালিকানায় বিদেশি পুঁজির অংশগ্রহণের ওপর যে বাধা নিষেধ ছিল, তা অনেক কমে গেছে, আমাদের বাজারকে বিদেশি জিনিস বিক্রির জন্য অনেক বেশি খুলে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের কিছু সংস্থার শেয়ার আন্তর্জাতিক স্টক মার্কেটে নথিভুক্ত হয়েছে।

■ বিশ্ব বাণিজ্যের নিয়ম কানুন আলাপ আলোচনাকে সংগঠিত করে প্রথমে ১৯৪৪ সালে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ অ্যান্ড ট্রেড চালু করা হয়েছিল। ১৯৯৫ সালে তারই উত্তরসূরি হিসেবে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা চালু করা হলো।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লু টি ও)

পয়লা জানুয়ারি ১৯৯৫-তে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো একমাত্র সংস্থা যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রণ করছে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ব বাণিজ্য যাতে মুক্তভাবে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ছাড়া চালিয়ে যাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য হলো সদস্য দেশগুলোর নাগরিকদের অবস্থার উন্নতি করা। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে যে এই সংস্থার নীতিগুলো ছলে বলে কৌশলে ধনী দেশগুলোর স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই করে। তবে তার মানে আবার এও নয় যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভেতরে দর কষাকষির কোনো জায়গা নেই।
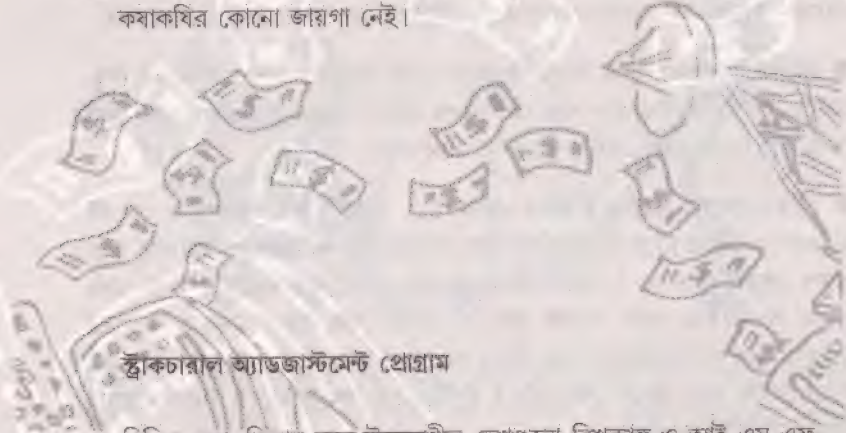
স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই এম এফ-এর কাছে সহায়তা চাইলে, এই দুই সংস্থা সে দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নীতি নির্ধারণ করে দেয় তাকেই বোঝাতে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট কথাটা ব্যবহার হয়ে থাকে। কথাটার বাংলা মানে হলো কাঠামোগত রদবদল। এই কথাটা এই কারণে এসেছে যে এই সংস্থাদুটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক ধরনের পরিবর্তনের উপদেশ দেয় (এবং ঋণ নিতে গেলে সেগুলো মানতেই হয়) যে পরিবর্তনের ফলে সেই দেশগুলোর অর্থনৈতিক (এবং রাজনৈতিক) কাঠামোয় বড় পরিবর্তন আসে। যেমন দেশের বাজারকে বিদেশি পণ্যের কাছে খুলে দিয়ে 'প্রতিযোগিতা'-য় উৎসাহ দেওয়া, বাণিজ্য ও শিল্পকে আরো বেশি করে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন করে তোলা, কাস্টমস শুল্ক কমিয়ে বাণিজ্যনীতিতে পরিবর্তন আনা, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা বিষয়ক নীতিতে পরিবর্তন করে দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ববাণিজ্যের টানাপোড়েনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পথে এগিয়ে দেওয়া। মোদ্দা কথা, রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কেটে ছেঁটে মুক্ত বাজারের বিকাশ ঘটানো।

ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস

কোনো সম্পদ তৈরি করতে একটা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস সেই পণ্যের ওপর বুদ্ধির অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের আইন বলা যেতে পারে। সাধারণত এই অধিকার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথাগতভাবে ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসকে দুভাবে ভাগ করা হয়—কপিরাইট আর কপিরাইটের সঙ্গে সম্পর্কিত রাইটস, যেমন গান, বই, ছবি, মূর্তি, কমপিউটার প্রোগ্রাম, ফিল্ম ইত্যাদির ওপর তাদের সৃষ্টিকর্তাদের অধিকার। সাধারণত এই অধিকার ৫০ বছর অবধি থাকে। এর সঙ্গে যুক্ত কিছু অধিকারও থাকে, যেমন রেকর্ডিং কোম্পানি, রেডিও বা টেলিভিশন কোম্পানি, অভিনেতা, গায়ক, নাচিয়ে ইত্যাদিদের অধিকার। দ্বিতীয়ত, শিল্প সংস্থার নিজস্বতা এককভাবে ব্যবহারে অধিকার, যেমন কোম্পানির নাম, লোগো (যেভাবে নামটা লেখা হয় বা যে প্রতীক ব্যবহার করা হয়); ভৌগোলিক বিশেষত্বের বা পণ্যের স্বাতন্ত্র্যের অধিকার যেমন দার্জিলিং চা, বাসমতী চালও এইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়াও পেটেন্ট নিয়ে কোনো পণ্যের ডিজাইন বা ব্যবসা সংক্রান্ত গোপনীয়তাকেও সংরক্ষণ করা সম্ভব। যেমন মারুতি কোম্পানি তার কোনো গাড়ির ডিজাইনের পেটেন্ট নিতে পারেন। আবার কোকাকোলার অধিকার আছে তার পানীয়ের মূল ফর্মুলা গোপন রাখার।

লিবারালাইজেশন

লিবারালাইজেশন বা উদারীকরণ বলতে মোটের ওপর অর্থনীতিকে বাজারের কাছে খুলে দেওয়ার কর্মসূচিকেই বোঝায়। অর্থনৈতিক উদারীকরণকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—যদিও এই দুটো সবসময় আলাদাও হয় না। বৈদেশিক ক্ষেত্রে উদারীকরণ বলতে সাধারণত বোঝায় কাস্টমস ডিউটি এবং অন্যান্য বাধা নিষেধ কমানোর বা সরানোর মধ্যে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে সুরক্ষার ব্যবস্থাগুলো কমিয়ে দেওয়া, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং এই বিনিয়োগের যাতায়াতকে সহজ করে তোলা। আভ্যন্তরীণ উদারীকরণ বলতে আমরা বুঝি দেশের ভেতরে শিল্পোদ্যোগের ওপর থেকে বিধিনিষেধ কমিয়ে দেওয়া, লাইসেন্স ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে দেওয়া, কর কমিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা, এবং ধীরে ধীরে বিনিয়োগের ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের সরে যাওয়া।

■ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কার্যত উন্নয়নশীল দেশগুলোর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল। বহু দেশের অর্থনীতি এই অর্থভাণ্ডারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এই ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী চলার চেষ্টা করল।

■ বিশ্ব ধনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী এগোনোর এই অর্থনৈতিক পথ অনেক দূর অবধি রাষ্ট্রের চরিত্র ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করল, এবং করে চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার কোনো রাষ্ট্রকে ঋণের শর্ত হিসেবে নির্দেশ দেয় যে সেই ঋণ পেতে হলে রাষ্ট্রকে কোন খাতে খরচ কমাতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগের হাতে ছাড়তে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে বিষয়টাকে নিছক অর্থনীতি হিসেবে দেখা সম্ভব নয়, এর সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে।

মনে হতে পারে এ তো ভালো কথা। সব দেশ যদি একটা সমান জায়গা থেকে বাজারে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তবে তো ভালোই, তাতে ক্ষতি কী? সত্যিকারের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তা হয়নি। তার অনেকগুলো কারণ আছে :

◆ বিশ্বায়নে আমরা যে বাজারে অংশগ্রহণ করছি সেটা পুরোপুরিভাবেই আধুনিক শিল্পোৎপাদনের মধ্যে দিয়ে তৈরি পণ্যের বাজার। এই ধরনের উৎপাদনে আজকের উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে এই

বাজারে হঠাৎ করে 'সমানে সমানে' অংশ নেওয়া সম্ভব নয়, এ কথা উন্নত দেশগুলোও খুব ভালো করেই জানে।

◆ উপনিবেশবাদের ইতিহাস ছিল কলোনিগুলোকে লুণ্ঠনের ইতিহাস। অথচ এই লুঠেরাদের থেকে ধার নিয়েই নাকি এখন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার (এবং ইউরোপেরও) 'গরিব' দেশগুলোকে বাঁচতে হবে, তাদেরই দেখানো পথে। ফলে প্রথমেই এই দেশগুলো একটা অসম জায়গা থেকে খেলাটায় নামতে বাধ্য হচ্ছে।

◆ ধনী দেশগুলো যে ধনী হয়ে উঠেছে, তা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে নয়, এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক দূর পর্যন্ত তৈরিই হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে। আজকের বিশ্বায়নের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে অনেক ক্ষেত্রেই ধনতন্ত্রের শক্তিগুলোর পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত দিচ্ছে উন্নত দেশগুলোর রাজনৈতিক শক্তি, যার অনেকটাই আবার সামরিক শক্তি।
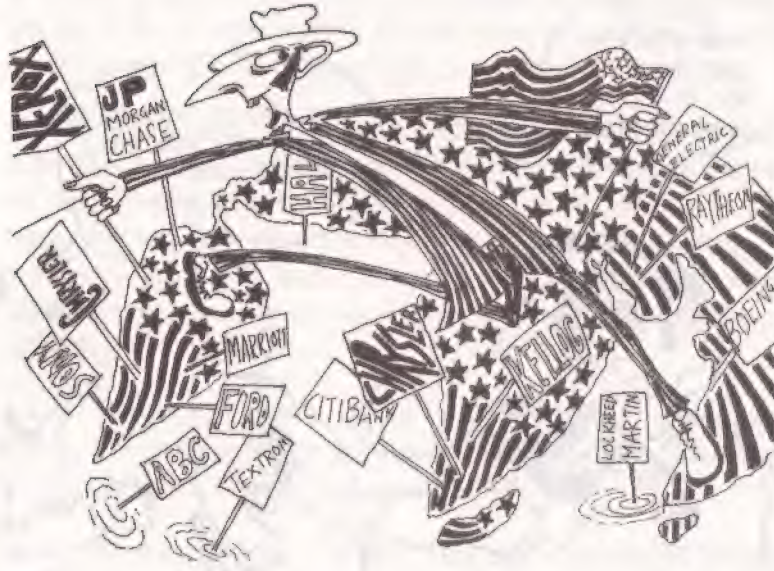
বহুজাতিক সংস্থার উত্থান

গত দশকে বহুজাতিক সংস্থা আর বড় বড় কর্পোরেশনগুলোর ক্ষমতা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে :

● অর্থনৈতিক লেনদেনের হিসেব ধরলে বড় সংস্থাগুলো এখন কেবল সবচেয়ে বড় দেশগুলো বাদ দিলে অন্য দেশগুলোর অর্থনীতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যদি আমরা দেশ আর সংস্থার তুলনা করি তাহলে দেখব পৃথিবীর বৃহত্তম ১০০টি অর্থনীতির ৫১টিই বহুজাতিক সংস্থা।

● রয়াল ডাচ শেল কোম্পানির রোজগার, ভেনেজুয়েলার মোট উৎপন্নের আয়ের থেকে বেশি। ওয়ালমার্ট কোং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির চেয়ে বড়, জেনারেল মোটরসের ব্যবসা আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর হাঙ্গেরির মোট অর্থনীতির সমান।

● পৃথিবীতে ৬৩,০০০টি বহুজাতিক সংস্থা আছে, তাদের ৬,৯০,০০০টি সহযোগী সংস্থা আছে। মোট সংস্থাগুলোর ৭৫ শতাংশই উত্তর আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং জাপানে অবস্থিত। পৃথিবীর বৃহত্তম ১০০টি সংস্থার ৯৯টিই শিল্পোন্নত দেশে অবস্থিত।

উৎপাদনের বিশ্বায়ন : ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের গোড়ার কথাটাই হলো ফ্লেক্সিবল অ্যাকিউমুলেশন বা যেখান থেকে যখন সম্ভব সেখান থেকে তখন ধন আহরণ। এই আদর্শ অনুযায়ী উৎপাদন ব্যবস্থাকেও যেখানে উৎপাদনের সবচেয়ে বেশি সুবিধা সেখানেই উৎপাদন, এই নীতি অনুযায়ী সাজানো হচ্ছে। এই সুবিধের হিসেব অনেক রকমের হতে পারে—কাঁচামালের সুবিধে, বিভিন্ন সরকারি কর ছাড়ের সুবিধে, সস্তায় ঠিকে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধে। আবার অনেক উন্নত দেশে পরিবেশকে বাঁচানোর নিয়মকানুন মানতে হলে উৎপাদনের খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়, গরিব দেশে এইসব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লাভজনক উৎপাদন করা যায়। এই কারণে আজকে একটা গাড়ির, এমনকী একটা জুতোরও বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি হতে পারে, কারণ এতেই সেই কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের লাভ বাড়বে, এবং তাঁদের লাভ বাড়লে, তাঁরা খুশি থাকলে, পেশাদার পরিচালকরা লক্ষ লক্ষ ডলার মাইনে পাবেন।

বাচ্চা: মা, আমাদের গ্রামে কী দারুণ নতুন কারখানা হয়েছে!

মা: হ্যাঁ, এখানে ওরা বিষ মেশানো কীটনাশক তৈরি করবে, আমাদের নদীর জল বিষিয়ে যাবে, এ কারখানা ওদের নিজের দেশে খুলতে পারত না।

MD: ভারতে খোলায় আমরা সস্তায় শ্রমিক পেয়েছি, করে ছাড় পেয়েছি, লাভ হবে দুই বিলিয়ন ডলার, আমার মাইনে এক মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।

ছাত্র: আমি বড় হয়ে এরকম MD হবো, কত পয়সা কামাব।
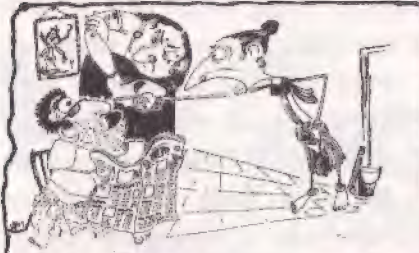
শ্রমিকদের অধিকার জেতার কথা যখন বলছ, পরিষ্কার করে বলে দিও যে, আমি বাড়ি বাড়ি কাজ করি বছরে ৩৬৫ দিন। কোনো ওভারটাইম, ৮ ঘন্টার কাজ আমার বাপের জন্মেও শুনিনি।

আমরা গোটা পরিবার বাড়ি বসে বিড়ি বাঁধি। শুনেছি এটা খুব বড় শিল্প। আমরা কিন্তু দিনে ১৬ ঘন্টা কাজ করি, ৩৬৫ দিন।

আমি ক্ষেতে কাজ করি। যেদিন পাই সেদিন খাই, যেদিন পাই না সেদিন উপোস, কোনো অধিকারের কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।
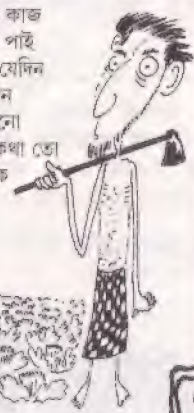
আমি পাতাল রেল, কলকাতার বড় বড় ব্রিজ অনেক বানিয়েছি। ঠিকাদার ফুরনে খাটায়, কোনো ছুটি, কোনো ওভারটাইমের বালাই নেই, সরকারি প্রজেক্টেও তো কাজ করি, কিছু তো পাই না।

আমি ইস্পাত কারখানায় ঠিকাদারের হয়ে ওই কয়লার গাদা সাফ করি ১০ বছর হলো। শ্রমিকদের ইউনিয়ন তো আমার মতো ঠিকে শ্রমিকদের জন্য মাথা ঘামায়নি কক্ষনো।

শ্রমের বিশ্বায়নঃ মানুষের ইতিহাসে আমরা বহু শ্রমিক বিদ্রোহ, দাস বিদ্রোহের কথা পড়ি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ধনতান্ত্রিক উৎপাদন একটা সংগঠিত রূপ নিল, শ্রমিকরাও সংগঠিত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায়ে অনেক দূর সক্ষম হলো। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, অন্তত সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে মালিকরা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া কিছুদূর মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে ইংল্যান্ডে থ্যাচার জমানা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রেগান জমানায় শ্রমিকদের অধিকারের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ নেমে এল।

আজকে বিশ্ব জুড়ে ধনতন্ত্র শ্রমিকদের অধিকারগুলোকে ক্রমাগত লঙ্ঘন করে তাদের আরো আরো বেশি শোষণ করার চেষ্টা করে চলেছে। উৎপাদন ব্যবস্থাগুলোকে উন্নত দেশ থেকে সরিয়ে গরিব দেশে নিয়ে আসছে। কারণ, উন্নত দেশে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেটাতে হলে খরচ অনেক বেশি হয়। গরিব দেশেও বহুজাতিক সংস্থাগুলো নিজেরা কারখানা না খুলে ঠিকাদারদের হাতে দিয়ে দিচ্ছে, ফলে কোনো দায়িত্বই তাদের নিজেদের নিতে হচ্ছে না, ঠিকাদার ঠিকা শ্রমিকদের ঘাড় ভেঙে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ফলে একই জুতো বানানোর জন্য আমেরিকার একজন শ্রমিক যা পয়সা পাবেন সেই অনুপাতে তার ১০০ ভাগের একভাগ পয়সায় গরিব কোনো দেশে কাজ করিয়ে নেওয়া যাচ্ছে, অন্য কোনো সুবিধাও দিতে হচ্ছে না। এই পদ্ধতির আরো একটা সুবিধে হচ্ছে যে গরিব দেশগুলো এমনিতেই বেকারির জ্বালায় ধুঁকছে, সেখানে সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারগুলোর কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধে আদায় করে নেওয়া যাচ্ছে। একবার গেড়ে বসার পর সেগুলো মানা হচ্ছে না। এইভাবে শ্রমিকদের পাকা অধিকার কাঁচিয়ে দেওয়ার ধান্দাটা দেখে অনেক স্থানীয় বা জাতীয় স্তরের মালিকও সুবিধা লুটছে। বহু কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকদের জোর করে অবসর গ্রহণে বাধ্য করে, না হলে সরাসরি ছাঁটাই করে, এক জায়গার কারখানা বন্ধ করে দিয়ে অন্য জায়গায় উৎপাদন সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, এরা শ্রমের ওপর খরচ কমাচ্ছে। ফলে চারদিকে ঠিকা শ্রমিকে ছেয়ে গেছে, যাদের না আছে কোনো অধিকার, না আছে বর্তমান বা ভবিষ্যতে রোজগারের কোনো নিশ্চয়তা।

লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আজ এক আশ্চর্য অনিশ্চয়তার শিকার। বাজারে চাহিদা বাড়লে যখন উৎপাদন হবে, শ্রমিক কেনা হবে। না হলে নয়। জিনিস যেরকম আমরা লাগলে কিনি, শ্রমিকও সেরকম লাগলে কেনা হবে, বাকি সময় দায়িত্ব থাকবে না। এই নীতিকে আবার মুক্তির নীতি বলে চালানো হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে এতে শ্রমিককেও বাঁধা পড়ে থাকতে হচ্ছে না, সেও স্বাধীন। শুনতে খুব ভালো, কিন্তু প্রশ্ন হলো বাঁকুড়ার গ্রামের একজন শ্রমিক যাকে টাটা স্টিল বা অন্য কেউ লাগলে পয়সা দিয়ে নেয়, বাকি সময় এই স্বাধীনতা দিয়ে করবে কী? সে তো এত পয়সা পায় না যে অনেকদিন বসে খেতে পারবে। এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই যে আবার কাজ হবে। এমন তো সমাজব্যবস্থা নয় যে সে সহজেই কাজ খুঁজতে অন্য কোথাও যাবে। এমন তো সরকার নেই যারা অন্তত খাবার, ঘর, পোশাক, পড়াশোনা, চিকিৎসার খরচ দিয়ে যাবে। এই নীতিতে মালিকের পয়সা বাঁচছে, শ্রমিকের সর্বনাশ হচ্ছে।

বিশ্বায়ন আর কর্মসংস্থানের আবার অন্য কয়েক রকম চেহারাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। গত কয়েক বছরে সাইবার-স্পেস বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক পন্থায় যোগাযোগ বিভিন্ন পেশা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর ফলে কিছু চাকরি তৈরি হচ্ছে। এই সাইবার-স্পেসে ঢুকতে যেহেতু কোনো বিশেষ দেশে বাস করার দরকার নেই, কমপিউটার আর নেটে ঢোকার সুযোগ থাকলে যে কোনো জায়গায় বসে কাজ করা সম্ভব, সেইজন্য আমাদের মতো দেশে কিছু কাজ তৈরি হচ্ছে। যেমন কলকাতায় বসে অনেকেই এখন আমেরিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য প্রতিদিন সংকলন করার কাজ বা মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপশন করে থাকেন। ওখানে যখন দিন শেষ হয় এখানে তখন দিন শুরু হয়, কাজেই ওঁদের রাতের মধ্যে এখানে কাজ হয়ে থাকে, ওঁরা আবার সকালেই পেয়ে যান। বলা বাহুল্য, আমেরিকায় শ্রমিকদের যে টাকা দিতে হতো আমাদের কমপিউটার-শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের তার চেয়ে অনেক কম মাইনেতে রাখা যায়। বাঁধা চাকরি দেওয়ার কোনো ব্যাপারও নেই। একেই বলে আউটসোর্সিং। এক্ষেত্রে অন্য অনেক দেশের চেয়ে ভারত সুবিধেজনক জায়গায়, কারণ ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলাম বলে আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার চল থেকেই গেছে। এই কাজের সুযোগ নিশ্চয়ই ভালো, তবে এর সম্পর্কেও চোখ কান খোলা রাখা ভালো। সবাই মিলে এর পেছনে দৌড়োনোর বিপদ সম্পর্কে জেনে রাখা দরকার। প্রথম কথা, এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে শ্রমের শস্তা দর নির্ভর, যে দেশে শস্তায় শ্রম পাওয়া যাবে, সে দেশে কাজ চলে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই কাজে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আমাদের দেশের মোট কাজের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য, কাজেই এইভাবে বিশ্বায়ন আমাদের বেকার সমস্যা দূর করবে ভাবা মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। তৃতীয়ত, এ কাজের জন্য কমপিউটার জানতে হয় এবং ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, সেই শিক্ষা আমাদের দেশে দুর্লভ ও দামি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

বিশ্বায়ন কি সর্বজনীন?

আমার বাছা-র তো কোনো বাছার স্বাধীনতা নেই

আমাদের শহরের দারুণ দারুণ বাজারে পৃথিবীর নামী দামী সব ব্র্যান্ডের জিনিস অঢেল পাওয়া যাচ্ছে। টিভিতে যা দেখছি তা খেয়ে ফেলতে, মেখে ফেলতে, পরে ফেলতে কোনো সমস্যা হওয়ার কারণ নেই। একদিক থেকে কথাটা সত্যি। কিছু মানুষের আজকের পৃথিবীর সবকিছুই প্রায় পাওয়ার, কেনার ক্ষমতা আছে। কিন্তু সবার কি?

তাছাড়া প্রচার করা হচ্ছে যে পৃথিবী থেকে সবার জন্য সব সীমানা মুছে যাচ্ছে। এর চেয়ে বড় মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না। বরং ঠিক তার উল্টোটা ঘটছে। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে ইউরোপ, আমেরিকায় যাওয়া আরো আরো কঠিন হয়ে উঠছে। বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে আক্রমণের ঘটনার পর তো আরোই বেশি বেশি করে। এমনিতেও ভেবে দেখা যাক না কথাটা কতটা সত্যি, কার জন্য সত্যি। যেমন ধরুন বাংলাদেশে রেডিমেড জামাকাপড়ের ব্যবসায় হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে। এদের সেলাই করা জামা রোজ লন্ডন, প্যারিস যায়। এই মেয়েদের কি সেখানে যাওয়ার কোনো সহজ সম্ভাবনা আছে? অবশ্যই নেই। কিন্তু এদের বাংলাদেশি মালিকের পক্ষে দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো সহজ, তাঁর কানাডিয়ান পার্টনারের তো অধিকাংশ দেশে যেতে ভিসাই লাগে না। কাজেই সবার জন্য সমান সুযোগ কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যা, এটা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো।

আমাদের দেশে বিশ্বায়ন

আমাদের দেশে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বায়নের পথ ধরার কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় রাজীব গান্ধির আমলে, ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে। সেই প্রথম আমরা উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ এইসব ধারণার কথা শুনলাম। আমরা শুনলাম বিশ্বায়নের মানে হলো উদার শিল্পনীতি আর মুক্ত বাজারের পথে চলা, এ পথেই উন্নত দেশগুলো চলে আরো আরো উন্নত হচ্ছে। বিশ্ব বাজারে আমাদের অংশগ্রহণের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, কারণ আমাদের দেশে একটা বিশাল মধ্যবিত্তশ্রেণী আছে, যাদের মন ও পকেট জয় করার জন্য বিশ্ব বাজার খুব আগ্রহী। একেবারে হাতেনাতে হিসেব করে দেখা গেল যে ১০০ কোটির দেশে প্রায় ২০ কোটি লোক বিশ্ব বাজারের উপযুক্ত ক্রেতা হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। কেবল মান্ধাতার আমলের সরকারি বাধানিষেধ, উন্নত বাজারের অভাবের জন্য তাদের মুখ শুকনো। তাদের মন জোগাতে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হলো, দেশে বিনিয়োগ করার, পুঁজিতে আরো বেশি বেশি অংশ নেওয়ার দরজা খুলে গেল, হু হু করে বিদেশি গাড়ি, বিদেশি জিনিসে বাজার ছেয়ে গেল। গর্বে আমাদের বুক ফুলে গেল। একটু যাদের সন্দেহ বাতিক, ভালো কিছুই দেখতে পারে না, তারা গাঁইগুঁই করছিল যে ২০ শতাংশ ভারতবাসীর এই বাজারে ক্রেতা নাগরিক হিসেবে চরে খাওয়ার ক্ষমতা যদিও বা থাকে, বাকি ৮০ শতাংশের কী হবে? তখন তাদের বোঝানো হয়েছিল যে এই বিশ্ব বাজারের ব্যবসার লাভ পুরোপুরি ঐ ২০ শতাংশেই শুকিয়ে যাবে না, নতুন মাল তৈরি হবে, নতুন বিকিকিনির মধ্য দিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, তার কিছুটা সুবিধা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচেও পৌঁছোবে বৈকি! আজ দেখা যাচ্ছে কলে, কারখানায়, চাষের ক্ষেতে, সর্বত্র দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে।

কলে কারখানায়: ১৯৮০-র তুলনায় অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হওয়ার পর থেকে আমাদের দেশে শিল্পে বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমে গেছে। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯০-৯২
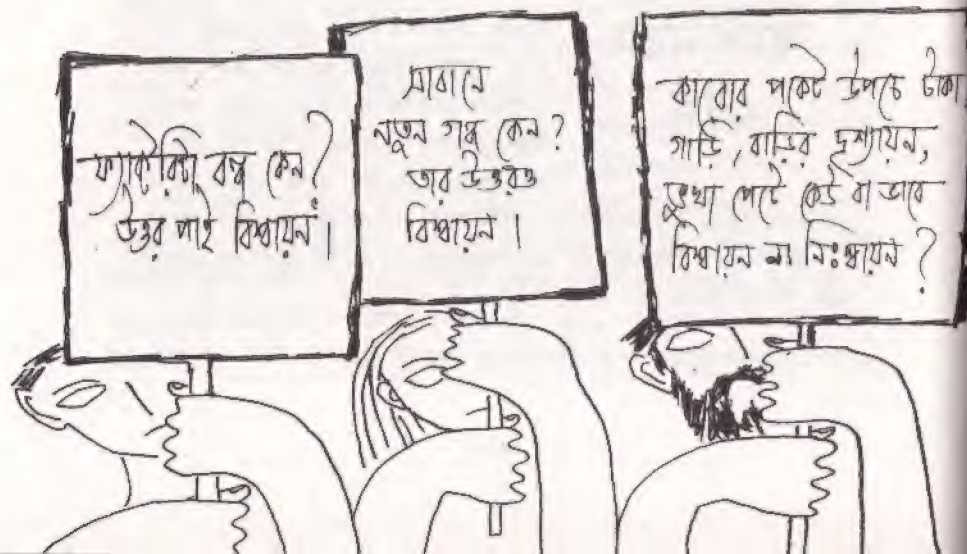
পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কেন?

অন্য জন্তু জানোয়ার এবং মানুষও যে এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে টিকে থাকতে পেরেছে তার একটা প্রধান কারণ হলো, এদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যেটুকু সম্পদ খরচ হয়েছে, সেটুকু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে আবার পূরণ করা গেছে। কিন্তু বড় মাপের শিল্পোৎপাদন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই এই হিসেবটা বদলে যায়। আজকে গাড়ি, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, এ সি মেশিনভিত্তিক যে জীবনযাত্রা চালু হয়েছে তার জন্য যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ খরচ হয় সেটাকে বেশিদিন চালালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। সবাই এটা জানেন। তা সত্ত্বেও আজকে লাভ বাড়ানোর জন্য ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের শক্তিগুলো বেপরোয়াভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯২ সালে রিওতে পরিবেশ নিয়ে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে পরিষ্কার করে এই কথাগুলো উঠে এসেছিল। কিন্তু তার পরেও ১৯৯৪ সালে মারাকেশ-এ ধনতান্ত্রিক শক্তিদের বৈঠকে পরিবেশের বিষয়টিকে বাজার দখলের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত হিসেবে দেখা হয়। যে আমেরিকা সারাক্ষণ দুনিয়ার নৈতিক দাদা সাজে, সে কিন্তু পরিবেশ বাঁচানোর চুক্তিতে সই করে না। কারণ, তাহলে তার অর্থনৈতিক স্বার্থে ঘা পড়বে।

পর্যন্ত শিল্পে বছর প্রতি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৬। ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০২-০৩-এ গিয়ে তা কমে দাঁড়ায় বছর প্রতি ৬.২। ১৯৯৩-৯৬—একটা সংক্ষিপ্ত সময়কাল বিলাসপণ্যের কৃত্রিম চাহিদার কারণে বৃদ্ধির একটা সাময়িক চেহারা তৈরি হয়েছিল, বাকি সময় ধরে শিল্পের হার কমার দিকে। শিল্পে বৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো শিল্পে লগ্নির পরিমাণ। ২০০২-০৩-এ আমাদের দেশে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন অর্থাৎ কারখানা এবং যন্ত্রপাতিতে লগ্নির পরিমাণ ১৯৯৬-৯৭ সালের তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে।
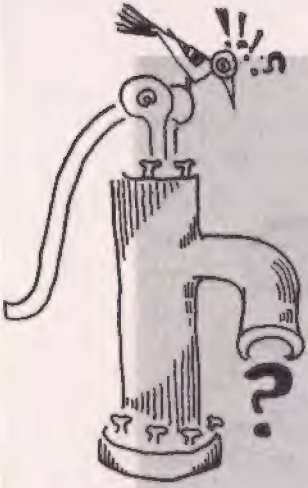
খাবার জলটুকুও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?

ক্ষেতের ফসল সবাই মিলে ভাগ করে খাওয়ার গল্প অনেক দিন আগেই চলে গেছে, গাছের ফলও তাই। এখন এগুলো পুরোপুরিই বাজারের পণ্য। বাকি ছিল জল আর বাতাস। বাতাসের চলাচল বন্ধ করা কঠিন, তাই এখনো টান পড়েনি, কিন্তু জলে এখন বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের হাত পৌঁছে গেছে। বাতাসেও পড়বে না ভাবা ভুল হবে, কারণ জল যে নিয়মে পণ্য হয়ে উঠছে, সে নিয়মে বাতাসকেও বিক্রি করা যাবে। জল একটা প্রাকৃতিক সম্পদ। এতে সব মানুষের সমান অধিকার। একদিকে নানা ব্যবসায়িক প্রকল্প ফেঁদে জলের প্রাকৃতিক উৎসগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আবার জল শোধন ও সরবরাহের ব্যবসার নামে জলকে পণ্য করে দিয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খুব বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই। খাস কলকাতা শহরেই জলে আর্সেনিক বিষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় মানুষ আক্রান্ত। এর প্রধান কারণ, কোনো পরোয়া না করেই যথেচ্ছ জল খরচ। চাষের কাজে শ্যালো পাম্প দিয়ে মাটির বুকের জল টেনে নেওয়া। গ্রামে গ্রামে সংরক্ষণের অভাবে পুকুর নষ্ট হয়ে যাওয়া, শহরে কোনোরকম দূরদৃষ্টি ছাড়াই হাজার হাজার মালটিস্টোরিড বাড়ি বানানো। বাঁচার উপায় যে মাটির ওপরের জল খাওয়া তার সম্ভাবনাও নদীর দূষণে, পুকুর ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে খুবই ক্ষীণ ও খরচ সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। ১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত ক্রমশ আরো কম কম লোক কাজ পেয়েছে। আর ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে ২০০০-০১ সালে নতুন কাজ তো বাড়েইনি বরং কাজ কমেছে। ছাঁটাই বেড়েই চলেছে।

ভারতবর্ষে অধিকাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে কোনোমতে পেট চালানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের অবস্থা তো আরো অনেক খারাপ। ২০০৪ সালে মার্চ মাসের হিসেবে দেখা যায় যে যদি ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের সব মানুষকে ধরে যাঁরা কাজ করতে চান ও পারেন এমন মানুষের সংখ্যা হিসেব করি, এই সংখ্যাটা হলো ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ। এঁদের মধ্যে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ কাজ পাবেন না। প্রতি বছর আরো ১ কোটি ৮ লক্ষ মানুষ এই কাজ চাওয়া ও করতে পারা মানুষের ভিড়ে এসে যোগ

চিকিৎসার সুযোগ কমছে কেন?

একদিকে মানুষের ক্ষমতা নেই প্রয়োজনীয় ওষুধটুকুও যোগাড় করার, অন্যদিকে ট্রপিক্যাল ডিজিজ বা তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি যে বিশেষ ধরনের অসুখের প্রকোপ বেশি, সেই ধরনের ওষুধ নিয়ে গবেষণার খাতে বড় বড় কোম্পানিগুলো গবেষণার টাকার খুব কম অংশই খরচ করে, কারণ তার ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা কম। তার বদলে হাজার কসমেটিক ধরনের ওষুধ বানিয়ে ধনী ক্রেতাদের বুঝিয়ে বেচতে পারলে লাভ বেশি। পৃথিবীর সব কিছুকেই বাজার হিসেবে দেখলে একজন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধও হলো বাজারের মাল। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ব্যবসার আসল চেহারা আমরা দেখতে পেলাম যখন এইচ আই ভি এইডস-এ ধনী দেশের মানুষও মারা যেতে লাগল—এই অসুখটা শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যেই আটকে রইল না। এইডস-এর ওষুধ নিয়ে গবেষণার হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। বলা বাহুল্য যে দামে একজন ধনী দেশের ধনী মানুষ ওষুধ কিনতে পারেন, বা একটা ধনী দেশের সরকারের পক্ষে ভরতুকি দিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ওষুধ দেওয়া সম্ভব, একটা গরিব দেশের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তার জন্য বহুজাতিকদের লাভ কমাতে হবে, বা স্থানীয়ভাবে যে কম দামি ওষুধ তৈরি হচ্ছে, তাকে বাজারে চলতে দিতে হবে। এই বিষয় কেন্দ্র করে আমরা এই বহুজাতিক ওষুধ সংস্থা ও তাদের সমর্থক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ামকদের অমানবিক চেহারা দেখতে পেলাম। একদিকে যখন মাছির মতো মানুষ মরছিল, এঁরা দর কষাকষি করছিলেন। আবার ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন সংগঠন এবং সরকার যখন এঁদের সঙ্গে লড়ে সুলভ চিকিৎসার দাবি আদায় করে নিলেন, তখন বোঝা গেল, যে লড়তে চাইলে এখনো লড়া যায় এবং লড়াই ছাড়া বাঁচার কোনো রাস্তা নেই।

জ্ঞানের অধিকার সংরক্ষণের নামে মানুষ খুনের ব্যবসা চালানো হচ্ছে কেন?

এ কথা আমাদের পরিষ্কার বুঝে নেওয়া ভালো যে আজকের দিনে পৃথিবীর আসল প্রভু হলো বহুজাতিক সংস্থাগুলো, যাদের নিয়ন্ত্রণ আবার ধনী দেশের ব্যবসাদারদেরই হাতে। ১৯৯৫ সালে, মূলত এদের চাপের মুখে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একটি চুক্তি অনুমোদন করে যার ফল সব দেশের মানুষ এবং বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক-ভাবে কোনো সংস্থা তার উদ্ভাবনের একক মালিকানা ভোগ করতে পারবে এবং তাদের এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব থাকবে বিভিন্ন দেশের সরকারের ওপর। সরকারগুলোকে দেখতে হবে যে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। আমাদের মতো দেশে এর ফল কী হচ্ছে দেখা যাক। চাষের ক্ষেত্রে চাষিদের বাধ্য করা হচ্ছে কিছু বড় কোম্পানির তৈরি বীজ কিনতে। কিছু কোম্পানি এমন বীজ তৈরি করেছে যা একবারের বেশি ব্যবহার করা যায় না। অন্য দিকে চাষি নিজের বীজও ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে সে পুরোপুরিই ওই বহুজাতিক সংস্থার দাস হয়ে পড়ছে। এর সুযোগ নিয়ে কোম্পানিগুলো বীজের দাম ইচ্ছেমতো বাড়িয়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই বীজ ব্যর্থ হলে চাষির আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকছে না। অবশ্য কোম্পানিগুলোর লাভ বাড়ছে, তাতে যদি বহু কোটি লোকের ক্ষতি হয়, জীবন যায়, কার কী আসে যায়?

দেবেন, অথচ কাজ বাড়বে বছরে ৪০ লক্ষেরও কম হিসেবে, অর্থাৎ প্রতি বছর আরো ৬৮ লক্ষেরও বেশি বেকার বেড়েই চলবে।

চাষের ক্ষেত্রে : কলকারখানা নিয়ে আমরা যতই লাফাই না কেন, চাষ আর চাষিই এ দেশকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে। এদেশের শিল্পও ভীষণভাবেই চাষের ওপর নির্ভরশীল। এখনো শস্তায় কাঁচামাল পাওয়া যায়, শ্রমিক পাওয়া যায়, তার কারণই হলো বিশাল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি আর সমাজব্যবস্থা কোনো না কোনোভাবে কোটি কোটি মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারা হয়তো খুব কম টাকা পাচ্ছে, ঠিক দাম পাচ্ছে না, কিন্তু অন্তত মরে যাচ্ছে না। আমরা এই চাষবাসকে উপেক্ষা করেই চলেছি। সরকারি বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, সে তুলনায় বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়েনি। এর ফলে উৎপাদনের হার কমে গেছে। কৃষিতে বেকারি বিপুলভাবে বাড়ছে। চাষের উপকরণের দাম বাড়া, ব্যাঙ্কের ঋণ কমা, ফসলের দাম কমা, সব মিলে ছোট চাষির নাভিশ্বাস উঠছে, জমি ধরে রাখতে পারছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জমি বেনামে বড় বড় মহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে বিকিয়ে দিতে হচ্ছে। এই মহাজনেরা ক্ষেতখামারের দৌলতে কোটিপতি হলেও সে টাকা যে আবার জমিতেই ঢালছেন তা নয়। অনেক সময়ই এই টাকা নেতাদের ঘুষ দিয়ে সহজতর ব্যবসায় রাতারাতি লাল হয়ে যেতে ব্যবহার হচ্ছে।

নীট ফল : এত যে বিশ্ব বাজারে অংশ নেওয়ার গল্প, উন্নয়নের গল্প, তার নীট ফল যে সবাই মিলে সমান ভাগে ভোগ করছে তা কিন্তু একেবারেই নয়। কিছু লোকের অবশ্যিই খুব রমরমা। ইউনিয়নের তোয়াক্কা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে, ছোট চাষিদের জমি মহাজনরা ফের দখল করে নিতে পারছে। কিন্তু অর্ধেকের বেশি মানুষ খাদ্যের অভাবে খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে আছে। শিশুমৃত্যু, অপুষ্টি, বয়স্কদের দুর্বলতা, মেয়েদের ও মায়েদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতা, স্বাস্থ্যের কোনো নিরিখেই কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে এগোচ্ছি না।

এই যে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাজারের মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে সবাই ইচ্ছেমতো জিনিস কিনতে পারবে আর তার মধ্যে দিয়েই জীবনমানের উন্নতি হবে, বাস্তবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ছবিটা আলাদা। অধিকাংশ মানুষের যে আয় কমে যাচ্ছে, আর মুষ্টিমেয় মানুষেরই শুধু অনেক অনেক পয়সা হচ্ছে, বাজারের চেহারা থেকে সে কথা পরিষ্কার। যেমন ধরা যাক হিন্দুস্তান লিভারের কথা। এঁরা কাপড় কাচার সাবান, শ্যাম্পু, প্রসাধনের নানান জিনিস, চা, বিস্কুট, দাঁতের মাজন বিক্রি করেন, বিরাট সংস্থা। এঁদের হিসেব থেকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে গত তিন বছরে (২০০০-২০০৩) এসব জিনিসের বাজার পড়ে গেছে, বাড়েনি। মানুষের হাতে যদি পয়সা না থাকে, যদি বেকারি বেড়েই চলে, সঞ্চয়ের সুদ কমতেই থাকে, তবে মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয়

খাদ্য বনাম প্রতিরক্ষা !

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আর ইউনাইটেড নেশনস চিল্ড্রেন্স ইমারজেন্সি ফাণ্ড হিসেব করে দেখায় যে এখন থেকে শুরু করে আগামী দশ বছর ধরে, প্রতি বছর ৮০ বিলিয়ন ডলারের সংস্থান করতে পারলে পৃথিবীর সব মানুষের কাছে খাবার, জল, স্বাস্থ্যের ন্যূনতম ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর এর চার গুণ টাকা প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করে। এই টাকা প্রতি বছর পৃথিবীতে অস্ত্র কিনতে যা খরচ হয় তার মাত্র ৯ শতাংশ, পৃথিবীতে বিজ্ঞাপনে যা খরচ হয় তার ৮ শতাংশ। পৃথিবীর চারজন ধনীতম মানুষের মোট সম্পদের পরিমাণ এই টাকার দু গুণ। তবে বাজারের নিয়ম দিয়ে গরিব মানুষদের কাছে পৌঁছোনো যাবে না, কারণ যে প্রায় ১.৩ বিলিয়ন মানুষ খাবার জল পান না, তাঁরা জল কিনতে পারবেন না। এর একমাত্র সমাধান হলো রাজনৈতিক, সামাজিক সদিচ্ছা দিয়ে সকলের জন্য ন্যূনতম সেবাগুলোর ব্যবস্থা করা।
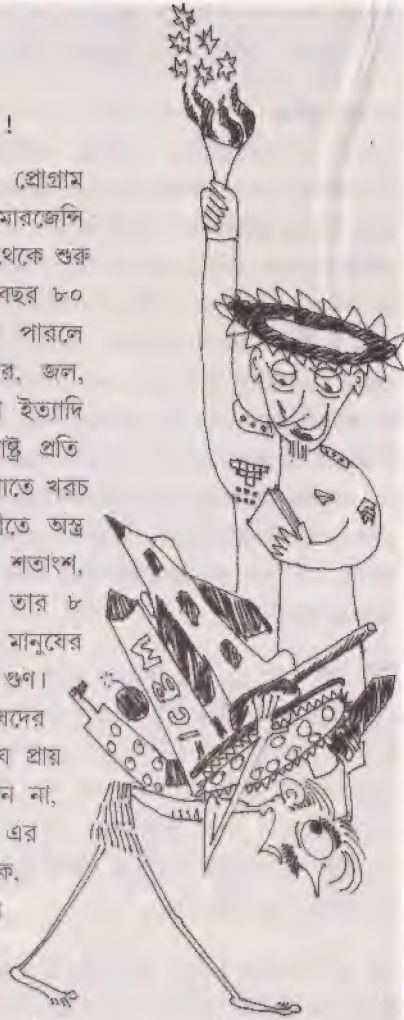
জিনিস কেনবার পয়সাই বা কোথা থেকে পাবে? আরো একটা জিনিস থেকে মানুষের বিপদটা বোঝা যাচ্ছে। লোকের একসঙ্গে টাকা খরচ করার ক্ষমতা নেই, বড় প্যাকেট কেনার সার্মথ্য কমে যাচ্ছে, তাই এখন কোম্পানিগুলো অধিকাংশ জিনিস ছোট ছোট একটাকা দু-টাকার প্যাকেটে বেচবার চেষ্টা করছে। উল্টোদিকে দামি দামি জিনিসের বাজার বাড়ছে। বলা বাহুল্য, এই বাজারগুলোর ব্যবসার নীতিটাই উল্টো। সাধারণ

সাবান, চায়ের বাজারে ব্যবসা হয় বেশি জিনিস কম দামে বেশি মানুষের কাছে বেচে, আর ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ, রঙিন টেলিভিশন, গাড়ির বাজারে ব্যবসা হয় কম জিনিস বেশি দামে কম মানুষের কাছে বেচে। এই বাজার বেড়েছে, কারণ সমাজের ওপরদিকে পয়সাওয়ালা মানুষ বাড়ছে। দেশি বিদেশি ব্যাঙ্কগুলোও এই বাজারে নেমে পড়ে ক্রমাগত জিনিস কিনবার জন্য ধার বাড়িয়ে চলেছে, ক্রেডিট কার্ডও এসে গেছে। চাষি জমি কেনবার জন্য ধার পাবে না, কিন্তু মহাজনের আরো গাড়ি কেনার জন্য ঋণের কোনো অভাব হবে না।

এ কাহিনী শুধু আমাদের দেশের মোটেও নয়। ১৯৮০ সাল থেকে ধনতন্ত্রের বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দুনিয়া জুড়ে দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। ২ ডলারের (১০০ টাকার মতো) কম খরচে দিন কাটান এমন মানুষের সংখ্যা ১৯৮৭ সালে ছিল ২৫০ কোটি। ১৯৯৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ কোটিতে। অর্থাৎ বেশি মানুষের হাতে বেশি ক্রয়ক্ষমতা আসছে, সেটা ভাবা ভুল। বড়লোক দেশ আর গরিব দেশের মধ্যে তফাত বেড়েই চলেছে। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ধনী দেশগুলোতে মানুষের আয় ছিল সবচেয়ে গরিব দেশের মানুষের আয়ের তুলনায় ৩০ গুণ বেশি। ১৯৯৭ সালে এই তফাত গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ গুণ। বোঝাই যাচ্ছে অনেক দেশের মানুষের দাম কমেই যেতে থাকছে।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন

ধনতন্ত্রের নেতৃত্বে ঘটে চলা বিশ্বায়নের যে রূপ আমরা দেখছি, তার একটা দিক তো অবশ্যই অর্থনৈতিক পুঁজি। উৎপাদন ও শ্রম সংগঠিত করার জন্য পৃথিবী জুড়ে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। উপনিবেশবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বিশ্ব বাণিজ্য দখলের জন্য উপনিবেশবাদকেও সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পথে যেতে হয়েছিল, তা না হলে অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা বা বজায় রাখা সম্ভব নয়। এর কারণ বুঝতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গ্রামশির কথায়, যেখানে আমরা শুনেছিলাম আধিপত্য বজায় রাখতে হলে গায়ের জোরের পাশাপাশি সম্মতি তৈরি করতে হয়। সংস্কৃতি সেই সম্মতি তৈরি করার আঙিনা হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতি কাকে বলে তাই নিয়েই একটা আলাদা বই লেখা যেতে পারে। সাধারণত, গান-বাজনা, নাচ, ছবি, ফিল্ম এই সবকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। কিন্তু সংস্কৃতি আসলে আরো অনেক ছড়ানো, আমাদের জীবন-জড়ানো একটা ব্যাপার। খুব সংক্ষেপে বুঝতে গেলে আমরা সংস্কৃতিকে একটা ধ্যান ধারণা ও মানে তৈরির মানচিত্র হিসেবে দেখতে পারি। যখন অনেক মানুষ কোনো কিছুর একটা মানে ভাগ করে নেন বা সেই মানেটা বুঝতে পারেন, তখন তাঁরা এক সংস্কৃতির অংশীদার বলে ধরে নেওয়া যায়। এ কারণে ভাষা সংস্কৃতির একটা প্রধান অংশ। যেমন যিনি বাংলা জানেন না তিনি 'সপাসপ এক সানকি পান্তাভাত সাবড়ে দিলাম' কথাটার মানে ধরতে পারবেন না। আবার এই কথাটার মধ্যে একটা ছবিও ফুটে ওঠে, বাংলার সঙ্গে পরিচিত না হলে সেই ছবির 'মানে' বুঝতে পারবেন না। গান-বাজনা, নাচ, সিনেমার বিচার করার ক্ষেত্রেও আমরা সমাজের এই বড় মূল্যবোধ বা মানেগুলোকে ঢুকিয়ে নিই। যেমন ক্লাসিকাল গান আমরা অনেকেই ভালোবাসি না, কিন্তু আমরা মনে করি সেটা আমাদেরই খামতি, এত সাধনায় যে জিনিস শিখতে হয় সে নিশ্চয়ই ভালো হতে বাধ্য। তার মানে এখানে আমাদের সমাজে পরিশ্রম বা সাধনার যে সম্মান সেটা আমরা গানের বিচারে নিয়ে আসছি।

সংস্কৃতিকে যদি একটা মানের মানচিত্র বা ম্যাপ হিসেবে আমরা দেখি, সে ম্যাপ তো সবকিছুকে জড়িয়ে ছড়িয়ে আছে, সেই সংস্কৃতিকে ধনতন্ত্র কী ভাবে ব্যবহার করতে চায়? মূলত দু-ভাবে :

- এমন একটা সংস্কৃতি বা জীবনবোধ তৈরি করা যাতে বাজার বেড়ে উঠতে পারে।
- এমন একটা সংস্কৃতি বা অভ্যাসবোধ তৈরি করা যাতে আমাদের সব সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানগুলোই কোনো পণ্য বা সেবার মধ্যে দিয়ে যায়। একটু বিশদ করে ব্যাপারগুলোকে বোধহয় দেখা দরকার।

বাজার বেড়ে উঠতে হলে প্রথমেই দরকার হয় চাহিদা। সাদা চোখে মনে হতে পারে চাহিদার আবার তৈরির প্রয়োজন কী! মানুষের প্রয়োজন থাকলেই সে জিনিস চাইবে আর সেই জিনিস বিক্রি হবে। বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, গল্পটা অত সোজা নয়, চাহিদা তৈরি করতে হয়। তেষ্টা পেলে জলও খাওয়া যায়, কোনো একটা কোল্ড ড্রিঙ্কও খাওয়া যায়, কিন্তু আজকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কোল্ড ড্রিঙ্কগুলো যে চাহিদা তৈরি করছে সেটা কি শুধু একটা শারীরিক তেষ্টার চাহিদা মেটানোর গল্প? না কি, মজা করার গল্প, আধুনিক হাওয়ার গল্প, প্রেম করার গল্প, আজকের চালাক-চতুর-নতুন-সফল ভারতের একজন হওয়ার গল্প? যে ভারত মালটিপ্লেক্সে সিনেমা দেখে, পপকর্ন খায়, ওয়ানডে-তে ইন্ডিয়া জিতলে মারুতি গাড়িতে কার-স্টিরিও চালিয়ে জাতীয় পতাকা নিয়ে বেরোয়। একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব যে চাহিদা কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সানসিল্ক শ্যাম্পু থেকে মারুতি গাড়ি থেকে পেপসি

থেকে প্যান্টালুনস থেকে এশিয়ান পেন্টস পর্যন্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের যদি আমরা লক্ষ করি দেখব, একটি দিনও এঁরা কিন্তু শান্তিতে বসে নেই, রোজই বলে যেতে হচ্ছে, আরো খান, মাখুন, লাগান, চড়ুন, পরুন, চুমুক দিন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর পরার, চড়ার, করার, লাগাবার নতুন নতুন কারণ খুঁজে খুঁজে বারও করে যেতে হচ্ছে।

আর একটু ভাবলে আমরা এও দেখতে পাব যে এই চাহিদা কিন্তু শুধু ব্যক্তির স্তরে তৈরি করা যায় না, কারণ ভোগকে একটা কাম্য আদর্শ বলে প্রচার করতে হলে সমাজে একটা ভোগের পক্ষে আবহাওয়া তৈরি করতে হয়। চারদিকে এই ভোগের আদর্শের জয়জয়কার—এ কিন্তু আমাদের দেশে চিরকাল, এমনকী ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত এতটা ছিল না। আমাদের সব ধর্মেই ভোগের চেয়ে ত্যাগের ওপর জোর বেশি ছিল। গান্ধিবাদকে আমরা জাতীয় আদর্শ বলে তো মেনে নিইনি, জীবনেও তেমন গ্রহণ করিনি কিন্তু মুখে বরাবরই আহা কী দারুণ বলে গেছি। সেই গান্ধিবাদেও ভোগের বিরোধিতা ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত বামপন্থার মতে ভোগ করা ছিল বড়লোকের

একচেটিয়া কারবার, তাদের শোষক চরিত্রের পরিচয়। সাধারণভাবেও পরিবারগুলোতে—দেশে এত গরিব মানুষ, ভোগ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না—এরকম একটা ভাবই জোরদার ছিল। আগেই আমরা কিছুটা আলোচনাও করেছি, কীভাবে ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতে ভোগের সপক্ষে একটা জোরদার মত তৈরি হয়ে উঠলো। রাষ্ট্রের সহায়তায় স্বাধীনতার প্রথম পঞ্চাশ বছরে ভারতে যে বিশাল

একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছিল তারা তাদের আত্মপ্রকাশের পূর্ণতা খুঁজলো ভোগের মধ্যে দিয়ে। এই চাহিদা থেকেই ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সপক্ষে একটা জোরদার সংস্কৃতি তৈরি হলো। এই যে ভারতীয় ক্রেতা নাগরিক, যাঁর হাতে এখন ভালো গাড়ি, ভালো জামাকাপড়, শ্যাম্পু, টেলিভিশন কেনার মতো টাকা আছে, চাপ দিতে শুরু করলেন যাতে এইসব জিনিস এ দেশে সহজলভ্য হয়ে ওঠে। এই কেনবার ক্ষমতা তাঁকে একটা বিশ্বায়িত ক্রেতা-সমাজের অংশ হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে সাহায্য করল।

এই যে ক্রেতা নাগরিকদের বিশ্ব-কল্পনা, তাতে নাগরিকত্ব লাভের একমাত্র রাস্তা হলো ক্রয়ক্ষমতা অর্জন, আর এই হিসেবে কিছুদূর হলেও পুব পশ্চিম ভাগ ঘুচে গেল। কারণ, রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার উচ্চবিত্ত শ্রেণীর একাংশ ক্রয়ক্ষমতার হিসেবে পশ্চিমের উচ্চবিত্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কলকাতার আলিপুরের ব্যবসায়ী পরিবার, কেনাকাটার অভ্যাসে বাগবাজার খালপাড়ের মানুষদের চেয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেদের সঙ্গে বেশি মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। বলা যেতে পারে, উপনিবেশে কিছু মানুষ আগেও এরকমই ধনী ছিল, কিন্তু এবার সংখ্যা হলো অনেক বেশি আর ধ্যান ধারণা আরো এক রকম। আবার উল্টোদিকে, পশ্চিমের গরিবরা দারিদ্র্যে পুবের গরিবদের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিল। সেদিক থেকে নিউ ইয়র্কের বেকার কালো পরিবার বাগবাজারের গরিবের কাছাকাছি চলে আসছিলেন। ফলে বিশ্ব জুড়ে একটা সমান্তরাল রেখা যেন টানা হচ্ছিল, যার ওপরে ক্রেতা নাগরিকদের বিশ্বায়ন আর নীচে গরিবদের দুনিয়া জোড়া নিঃস্বায়ন চলছিল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ঠিক আছে, কারো যদি ক্ষমতা থাকে, আরো ভোগ করতে চায়, তবে করুক না, কার আর বাড়তি ক্ষতি কী হচ্ছে? এর সঙ্গে রাজনীতি অর্থনীতির সম্পর্কই বা কী? কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখতে পাব, সম্পর্ক আছে,

গভীরভাবেই আছে। যেমন ঢালাওভাবে বিদেশি জিনিস আনার জন্য দেশের আমদানি আইন পাল্টাতে হয়। জিনিসে গুণমানে উন্নতির নামে যদি কোনো বিদেশি সংস্থা কোনো কোম্পানিতে শেয়ার বাড়াতে চায়, তার জন্য বিদেশি বিনিয়োগের ওপর বিধি-নিষেধ পুনর্বিবেচনা করতে হয়। এগুলো সবই একটা দেশের পক্ষে বড় বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আবার এইসব সিদ্ধান্তের ফলে দেশে তৈরি জিনিস মার খেতে পারে, বহু স্থানীয় কলকারখানা বন্ধ হয়ে মানুষের চাকরি যেতে পারে। বিশাল বিশাল বিদেশি বা তাদের দেশি পার্টনারদের সুপার মার্কেট চালু হলে পাড়ার বাজার-দোকান মার খায়। খাবারের চেইন স্টোর ছোট ছোট রেস্টুরেন্টের ব্যবসায় ভাগ বসায়। বহুজাতিক সংস্থা এদেশে ব্যবসায়ে শেয়ার বেশি কিনে নিলে অনেক টাকা বিদেশে চলে যায়। অতএব বোঝা যাচ্ছে, ক্রেতাদের ভোগের দাবি আপাতদৃষ্টিতে যতটা নিরীহ মনে হয়, অতটা নিরীহ নয়। তাদের ঝাঁ-চকচকে জিনিস কেনার শখের জন্য দেশকে, অনেক মানুষকে অনেক দাম দিতে হয়।

অতএব ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে এগিয়ে নিতে হলে শুধু ব্যক্তি ক্রেতার মধ্যে চাহিদা তৈরিই যথেষ্ট নয়, কারণ কেবল সেই চাহিদাই তো বাজার তৈরি করতে পারে না, রাষ্ট্র যাতে বাজার স্থাপনের পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন আইন রদ করে বা

নতুন আইন জারি করে, সেই চাপও দিয়ে যেতে হয়। আর এই মতামতের সংস্কৃতি তৈরি করার জন্য কাজে নামেন মুক্তবাজারপন্থী পণ্ডিতরা, বিশ্বব্যাঙ্ক বা আই এম এফ জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী অর্থনৈতিক সংস্থার মাধ্যমে, ইউরোপ আমেরিকার রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে, বিশ্ববিখ্যাত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে, খবরেরকাগজে, পত্রপত্রিকায় একের পর এক ম্যানেজমেন্ট গুরুর্ কলাম থেকে ক্রমাগত এই মুক্ত বাজারের জয়গান গেয়ে যাওয়া হয়।

একধরনীকরণ: প্রায়ই আমরা একটা কথা শুনি যে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি ধরণী বা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ায় সবকিছুকে এক ধরনের করে দেওয়ারও চেষ্টা চলছে। একে আমরা হোমোজেনাইজ়েশন বলে জানতে শিখেছি। কথাটা অনেক দূর পর্যন্ত ঠিক. আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে নানা দিক থেকে যেন বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে। আমাদের মতো দেশে কয়েকশো মাইল গেলেই মানুষের চেহারা, পোশাক, খাবার, বাড়িঘর সবই কেমন আলাদা ছিল, এখন বাজারের দৌলতে সব এক ধরনের। চেন্নাই থেকে চেরাপুঞ্জি সবাই জিন্স পরছে, গৌহাটি থেকে গোয়া সবাই কোকাকোলা বা পেপসি খাচ্ছে, মিরাঠ থেকে মেদিনীপুর সবাই নাইকে পরছে, আম্বালা থেকে আগরতলা সবাই এমটিভি দেখছে। আর শুধু এরা নয়—এই পেপসি, এই নাইকে, এই এমটিভি সারা দুনিয়ার সবার রুচিকে এক ধরনের করে দিচ্ছে। এর দুটো মূল কারণ আছে। একদিকে বাজার অবশ্যই চেষ্টা করবে সবকিছুকে একরকম করে দিতে, সোজা কথায় তাতে ব্যবসার সুবিধে। ভাবুন না, লুঙ্গি-ধুতি-পায়জামা-চুড়িদার-শাড়ি এত কিছু বানানো, সাপ্লাই দেওয়ার বদলে শুধু জিন্সের ব্যবসা করতে পারলে উৎপাদন, হিসেব সবকিছুই অনেক সহজ হয়ে যায় না কি? অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক, স্রোতটা মূলত বয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে। আমরা আগেও আলোচনা করেছি, এর মূলে আছে একটা পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ, মোহ। এই আধুনিকতার পণ্য রূপটা অবশ্যই পশ্চিমি সংস্কৃতি থেকে জন্ম নেওয়া, সেইজন্যেও অনেকটা এই একধরনীকরণ, কারণ এই ক্রেতারাও পশ্চিমের ভোক্তাদের ধরনেই নিজেদের তৈরি করতে চান।

কিন্তু এইটুকু বলেই আবার বলা দরকার যে সহজ কোনো ফর্মুলায় আবার গোটা অভিজ্ঞতাকে ফেলা যাবে না। বাজার কিন্তু অতীব বুদ্ধিমান একটি জীব, সে আত্মরক্ষা, আত্মবিকাশের জন্য, নিজেকে ক্রমাগত বদলে চলে। আজকে বাজারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বেনেটনের পোশাক, কোকাকোলা, এইচ এস বি সি ব্যাঙ্ক, সব বিজ্ঞাপনে বৈচিত্র্যের জয়জয়কার। কত রকমের মানুষ, কেউ বেঁটে, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ ভয়ানক মোটা, কেউ সাংঘাতিক রোগা—সবাই নিজের নিজের তালে আছে আর নানারকম জিনিস কিনে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে ১৯৮০-৯০-এর দশকে বিজেপির নেতৃত্বে হিন্দুত্বের খুব রমরমা হয়েছিল। এই হিন্দুত্বের সমর্থকরা অনেকেই ছিলেন খুবই উচ্চবিত্ত মানুষ, বিদেশে বসবাসকারী সচ্ছল ভারতীয়দেরও অনেকেই এই আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদে একটা সনাতন হিন্দু সমাজের মূল্যবোধের জয়জয়কার ছিল, হিন্দু পরিবারের একটা গুণগান গাওয়ার ব্যাপার ছিল। দেখা গেল যে বাজারের তাতে কোনো অসুবিধে নেই। একদিকে একের পর হিন্দি ছবি এই ভারতীয়ত্বের গল্প নিয়ে দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্যে ভালো ব্যবসা করল, অন্যদিকে পান পরাগ থেকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন, পবিত্র গঙ্গাজলে তৈরি সাবান থেকে নতুন কোরিয়ান গাড়ি—সবেতেই এই হিন্দু পরিবার ক্রেতা নাগরিক সমাজের কেন্দ্রীয় ইউনিট হয়ে উঠল। 'সিঁদুর-সাঁস-বহূ-সসুরাল-পরণাম' বাজারের সেলস ফোর্স হিসেবে কাজ করল। অতএব বাজার সব কিছুকে এক করে দিচ্ছে এই নিয়ে অতি সরল ঘ্যানঘ্যান করে পায়ের নীচে মাটি পাওয়া যাবে না।

ম্যাকডোনাল্ডকে
দেখুন, সবাইকে
আমেরিকান বিফ
এনে খাওয়াচ্ছে
কি? মোটেই না,
তাতে ব্যবসা
হয় না।
ম্যাকডোনাল্ডের
দোকানে আসুন,
তন্দুরি চিকেন
বার্গার খান,
ভেজিটারিয়ান
বার্গার খান,
ম্যাকডোনাল্ড
ব্র্যান্ডের তৈরি
কিছু আপনার
পেটে, আর
লাভটা
ম্যাকডোনাল্ডের
পেটে গেলেই
হলো।
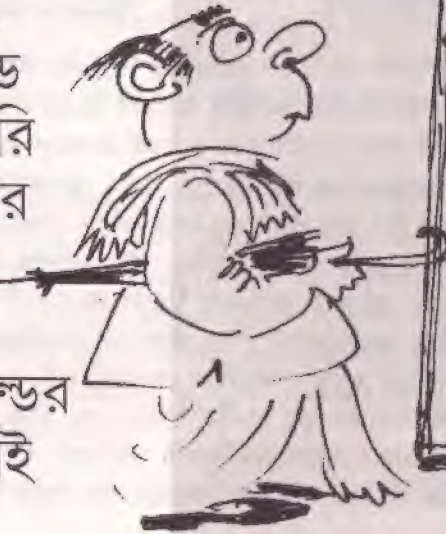
বিশ্বায়নের বোকা বাক্স : ইংরেজিতে টেলিভিশনকে হাল্কাভাবে অনেক সময় ইডিয়েট বাক্স বা বোকা বাক্স বলা হয়। কারণটা যেন এই যে এতে সব সময় বোকা বোকা জিনিস দেখানো হয়, অথবা টেলিভিশন নিয়মিত দেখলে বোকা হয়ে যেতে হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নে টেলিভিশনের ভূমিকা যদি বোঝার চেষ্টা করি দেখব এত বুদ্ধিমান আর কাজের যন্ত্র বোধহয় আর দুটি হয় না। তবে মাথায় রাখতে হবে প্রাথমিকভাবে কার জন্য, কার স্বার্থে এই যন্ত্র কাজের?

আমাদের দেশে এখন অনেক ঘরেই টেলিভিশন, শুধু শহরে উচ্চবিত্তের ঘরে নয়, গ্রামের দিকেও অনেকটাই ঢুকে গেছে এই বাক্স, যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানেও গাড়ির ব্যাটারি জেনারেটর—নানান উপায়ে টেলিভিশন দেখা চলে। বলা হয়ে থাকে টেলিভিশন দেশের সীমানাগুলো ভেঙে দিয়ে বিশ্বের এক প্রান্তের ছবি অন্য প্রান্তে দেখিয়ে রাষ্ট্রের বিপদ ডেকে এনেছে। ছাপার অক্ষর যদি দেশের নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করে থাকে, টেলিভিশনই এক বাজার-বিশ্বের নাগরিকত্বের বোধ তৈরি করছে, এতে দেশের সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে। অভিযোগটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক কালনার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ে, স্কুলে পড়ছে। সাধারণ হিসেবে কলেজে পড়তে পড়তে তার বাঁকুড়ার কোনো একটি সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে, সাধারণ হিসেবে সব ঠিকঠাক চললে একটি দুটি ছেলেমেয়ে হবে। বাড়িতে শাড়ি, পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সালোয়ার কামিজ পরে জলে নেমে বাকি জীবন কেটে যাবে, কপাল ঠিক চললে ফ্রিজ, টিভি মিক্সি তো হবেই, বাজাজ স্কুটারও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখন সে টেলিভিশনে নানা কিছু দেখে। নানা মেয়ে, তাদের নানান জীবনের ধরন, নানা পুরুষ, প্রেম, ভোগ, আনন্দ, কাজের জগৎ। এইসব দেখে সে যদি তার প্রায় পূর্বনির্ধারিত ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে তো ঘোর বিপদ। সে মডেল হতে চাইতে পারে, অতি স্বাধীন পোশাক আশাক পরে পাড়ায় আওয়াজ খেতে পারে এবং তাতেও দমতে না পারে। সে চাকরি করতে চাইতে পারে, এক্ষুনি বিয়ে করতেই না চাইতে পারে। আবার টেলিভিশন দেখে দেখে তার কাম্য পুরুষ, প্রেম, যৌনতা থেকে শুরু করে নানান জিনিসের প্রতি আকর্ষণও এমন বাড়তে পারে যে বাকি জীবনের জন্য বাঁকুড়া শহরে দুই অরক্ষণীয়া ননদ সহ একতলা শ্বশুরবাড়ির একটা ঘর এবং ভাগের পায়খানা সে মানতে নাও পারে। সবটাই যে শুধু অন্যদের জন্য সমস্যা হয়ে উঠবে তা নয়, সে নিজেও যা চাইছে আর যা পেতে পারে তার মধ্যের ফারাক নিয়ে অবসন্নতায় ভুগতে পারে।

টেলিভিশনের বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগই এটা যে টেলিভিশন আমাদের শারীরিক অবস্থানের জায়গা, যেখানে আমাদের আটকে থাকতেই হয়, আর আমাদের মনের পরিসর বা কল্পনার আঙিনার মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে গোলমাল পাকিয়ে দেয়। কালনার মেয়েটিকে শারীরিকভাবে কালনা থেকে বাঁকুড়ার সীমারেখার মধ্যেই বাস করতে হবে, কিন্তু মানসিকভাবে সে এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক অন্য বিশ্বে বাস করতে চাইবে, যে বিশ্বের ছবি টেলিভিশন না থাকলে তার দেখারই কথা নয়, অতএব এই কষ্টে ভোগারই কথা নয়। কিন্তু এখন সে নিজেও জ্বলবে, অন্যদেরও জ্বালাবে। ভেবে দেখলে হয়তো দেখব যে মেয়েটির জন্য যে জীবন অপেক্ষা করে আছে তা মেনে নিলে সকলেরই সুবিধে বলেই যে সেটা খুব আদর্শ একটা জীবন তা নয়। সেটা এক বন্দীদশাও হতে পারে, কাজেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শেখালে সেটা টেলিভিশনের দোষ না হয়ে গুণ বলেও ভাবা যেতে পারে।

সমস্যাটা অন্য জায়গায়। গ্লোবাল টেলিভিশন কিন্তু কোনো প্রকৃত অর্থে গোটা বিশ্বের ছবি দেখায় না। এর ভাষা বাজারের ভাষা, এর ছবি বাজারকে সাহায্য করার উপযুক্ত ছবি মাত্র। গ্লোবাল টেলিভিশন জুড়ে মূলত আমরা দেখি পশ্চিমী উন্নত দেশগুলোর উচ্চবিত্তদের জীবনধারা এবং আমাদের সিরিয়ালগুলোতে আমাদের দেশের উচ্চবিত্তদের জীবনের গল্প। খবরে কোনো দুর্ঘটনা বা দারিদ্র্যের গল্প ছাড়া, কিংবা ডিসকভারি ধরনের চ্যানেলে আশ্চর্য জীবনধারা মার্কা ডকুমেন্টারি ছাড়া গরিব দেশের গল্প কোথায়? (এখানেও কিন্তু পশ্চিমের জীবনকে স্বাভাবিকের সংজ্ঞা হিসেবে ধরে নিয়েই এই অপূর্ব আশ্চর্যের ধারণা তৈরি হয়।) টেলিভিশন তো এই মেয়েটির জীবনে একটা সত্যিকারের অভাববোধকে ঠিকই ধরেছে। সে জীবনটাকে বদলাতে চায়। কিন্তু লাতিন আমেরিকার মেয়েরা কীভাবে সমবায় গড়ে জীবন বদলাচ্ছে, তার গল্প তার কাছে লভ্য কী? টেলিভিশন এর একটা খাঁটি প্রয়োজনকে ধরে তাকে বাজারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, বলবে সুখ মানে ক্যাডবেরি, জীবন পাল্টাতে পারে এল জি ওয়াশিং মেশিন, মুক্তির মানে হিরো হন্ডা। মনে রাখতে হবে টেলিভিশনের এই ক্ষমতা কিন্তু কেবল আজকে তৈরি হয়নি, প্রগতি মানে যন্ত্রসভ্যতায় তৈরি পণ্যের ভোগ, এই ধারণা আমরা উপনিবেশবাদ থেকে শুরু করে স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছর ধরে মেনে এসেছি, টেলিভিশন তাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাত্র।

এটাও মনে রাখা দরকার যে প্রগতির প্রতি এই ধারণায় আমাদের সম্মতির শিকড়ও খুব গভীরে, তাই রাতারাতি বিকল্প সম্মতি বা সম্ভাবনা তৈরি হয় না, হবেও না। টেলিভিশনে লাতিন আমেরিকার মেয়েদের সমবায় সমিতির কথা জানলেই যে মেয়েটি ঝাঁপিয়ে পড়ে পাড়ায় কিছু একটা সংগঠিত করে ফেলবে সেই সম্ভাবনা প্রায় নেই। তার ঝামেলা আরো অনেক বেশি।

এখন টেলিভিশন কেন বাজারের বিকাশে সাহায্য করবে বলে রাগ করাটা জাল কেন মাছ ধরছে বলে রাগ করার মতোই নিরর্থক। টেলিভিশনের কাজ বাজার তৈরি। নাচ গান, নাটক তার অজুহাত মাত্র। কী ভাবে? একটু টেলিভিশনের অর্থনীতি বোঝার চেষ্টা করা যাক। যে কোনো শিল্পপণ্য বা মাধ্যম টিকে থাকতে পারে তিনটি উপায়ের একটি অবলম্বন করে:

■ সরাসরি পণ্য হিসেবে নিজেকে বেচে, যেমন গানের ক্যাসেট, সিনেমা, গল্পের বই। মূলধন লগ্নি করে তৈরি, বেচে পয়সা করতে পারলে লাভ, না হলে ক্ষতি। কিছু কিছু টেলিভিশন পে চ্যানেলও গ্রাহকদের থেকে পয়সা নিয়ে এইভাবেই পুরোটা বা আংশিক পয়সা তোলার চেষ্টা করে।

■ অন্য কোনোভাবে অর্জিত পয়সার সমর্থনে, যেমন সরকারের আনুকূল্যে তৈরি ছবি, নাটক ইত্যাদি। এগুলো সরকারি তহবিল, অর্থাৎ বিভিন্ন কর থেকে সরকারি রোজগার দিয়ে তৈরি। এই শিল্পবস্তুগুলোর তাই পণ্য হিসেবে বাজারে লড়ে যেতে হয় না, তারা এক ধরনের সুরক্ষিত জায়গায় টিকে থাকে। এই পরিসর ক্রমাগত ছোট হয়ে চলেছে। আমাদের জাতীয় টেলিভিশন, দূরদর্শনও এইভাবেই চলত, কিন্তু বাজারের সমর্থকরা 'রাষ্ট্রের আর সংস্কৃতিতে নাক গলানো উচিত নয়' বলে দাবি তুলছেন, আর দূরদর্শনকেও অন্যভাবে ভাবতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিবিসি-রও এই মডেল ছিল, এখন বিবিসি-কেও অন্যভাবে ভাবতে হচ্ছে।

■ এই অন্যভাবে ভাবা মানে তিন নম্বর উপায়। এই উপায়ে কোনো মাধ্যম বা শিল্পদ্রব্য অন্য কোনো বাণিজ্যিক পন্থার বাহন হয়ে টিকে থাকতে পারে। এটাই আমেরিকান টেলিভিশনের মডেল এবং এখন আমাদের সব টেলিভিশনের মডেল। এই মডেলে একটা টেলিভিশন চ্যানেলকে এমন সব অনুষ্ঠান ভাবতে হয় এবং বানাতে হয়, যে অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপনদাতাদের আকর্ষণ করবে, কারণ বিজ্ঞাপনদাতারা এই বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্য সময় কিনতে যে টাকা দেন তাতেই চ্যানেল চলবে।

এর মানে হলো যে টেলিভিশন আসলে তার দর্শকদের নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমাদের সংবাদপত্রগুলোও তাই করে। এই বিষয়ে নিয়মিত সংগঠিত গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ চলতে থাকে। এই রিসার্চের ওপর ভিত্তি করে একটি

চ্যানেল একটি ডিটারজেন্টের কোম্পানিকে বলতে পারে যে—আমাদের সিরিয়াল দেখেন ভারতের বড় বড় ৭টি ও ছোট ৫৬টি শহরের বাসিন্দা উচ্চবিত্ত পরিবারের ১ কোটি গৃহিণী। এঁদের ৭৮ শতাংশ হলেন ৬ থেকে ১৬ বছরের বাচ্চার মা, এঁরা প্রতি বছর ২৮ কোটি টাকার সাবান কেনেন। আপনি কি চান না যে এঁরা আপনার সাবানের বিজ্ঞাপন দেখুন?

আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে বিশ্বায়ন সর্বজনীন নয়, আমাদের দেশে কিছু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেও অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে বাড়ছে না। যার ক্রয়ক্ষমতা নেই এমন মানুষদের নিয়ে মাথা ব্যথা নেই টেলিভিশনের, সেটা টেলিভিশন দেখলেই বোঝা যায়। চ্যানেল থেকে চ্যানেলে যান, দেখবেন মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্ত মুখের ভিড়, গরিব মানুষেরা অদৃশ্য বললেই চলে, মাঝে মাঝে কোনো দুঃখকষ্টের খবরে তারা কী রকম ছায়ার মতো উদয় হয়, নইলে তাদের জায়গা হয় না। যারা কিছু কিনবে না তাদের দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কী দরকার। মধ্যবিত্তরাও এই গরিবদের আর দেখতে চান না। এর ফলে মিডিয়ার দর্শক হিসেবে মানুষের সংখ্যা ক্রমশ কম জরুরি হয়ে উঠছে, ১ লক্ষ গরিব লোক একটা প্রোগ্রাম দেখার চেয়ে ১০ হাজার বড়লোক দেখা ভালো, কারণ প্রোগ্রামটার ফাঁকে যে বিজ্ঞাপন হবে তা তো তাঁদের জন্যই।
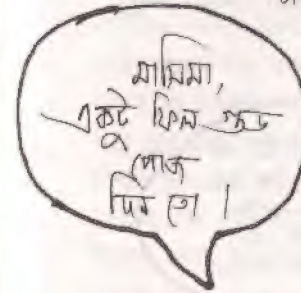
কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবা হতো যে টেলিভিশন মধ্যবিত্তদের জন্য হলেও সিনেমা এখনো গরিব লোকেদের জন্য তৈরি হয়, কারণ তাকে তো সরাসরি নিজেকে বেচে খেতে হয়, তাই যত বেশি দর্শক হয় ততই ভালো। কিন্তু এখন সেই মডেলও পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। নতুন অর্থনীতিতে আমরা দেখছি বহু গরিব পাড়ার হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নতুন মালটিপ্লেক্স, যেখানে টিকিটের দাম বহু গুণ বেশি। ফলে সে হলে কেবল উচ্চবিত্তরাই যাচ্ছেন। তারপর ছবি যদি আরো বড় করে লেগে যায় কেউ তো আপত্তি করেনি গ্রামের হলে প্রিন্ট পাঠাতে। এর ফলে প্রচুর নতুন ছবি আমরা দেখছি যেগুলো উচ্চবিত্তদের জন্য, উচ্চবিত্তদের নিয়ে, উচ্চবিত্তদের বানানো ছবি। এই বিকিকিনির দুনিয়ায় গরিব লোকদের কোনো স্থান নেই। দামি রেস্তোরাঁ, দামি সুপারস্টোর, কম সংখ্যক মানুষকে বেশি দামি মাল বেচে ফুলেফেঁপে উঠছে। আর বেকারি, ছাঁটাই, ভি আর এস-এ ধুঁকতে থাকা বহু মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের বারুদ জমে উঠছে। তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলোতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত এমন স্তরে পৌঁছেছে যে মধ্যবিত্তরা পাহারা দেওয়া বাড়িতে থেকে, বুলেটপ্রুফ কাঁচের গাড়িতে কোনো মতে বাজার করেই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ চারপাশে ক্রুদ্ধ, আক্রমণাত্মক দরিদ্র মানুষের ভিড়।

রাজনৈতিক বিশ্বায়ন

আমরা আমাদের চারপাশে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা দেখতে পাচ্ছি, তার মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক। আমরা এও দেখেছি যে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এ কাজ করে ওঠা যায় না, এর জন্য ধনতন্ত্রের পক্ষে সম্মতি তৈরি করতে হয়, এবং সেটা করা সম্ভব একটা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। আবার এই অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক, যে প্রক্রিয়াই হোক না কেন, সেগুলোকে চালু রাখতে একটা রাজনৈতিক শক্তি লাগে, একটা রাজনৈতিক কাঠামো লাগে। এই ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে সম্ভব করে তুলতে হলে যে ধরনের কাঠামো তৈরি করতে হবে, প্রশ্ন হলো তার জন্য আমাদের চেনা কাঠামোগুলোকে কতটা পাল্টানো দরকার হয়ে পড়বে?

বিশ্বায়ন ও রাষ্ট্র: বিশ্বায়নের আলোচনায় প্রথমেই যেটা শোনা যায় সেটা হলো বিশ্বায়ন মানেই হলো রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমে যাওয়া, এমনকী তার অস্তিত্ব নিয়েই সংকট দেখা দেওয়া। বিশ্বায়ন নিয়ে যাঁরা লিখছেন তাঁরা অনেকেই লিখেছেন বিশ্বায়নের প্রাথমিক লক্ষণই হলো রাষ্ট্রের সীমান্তকে চ্যালেঞ্জ করা। আপাতদৃষ্টিতে একথা ঠিক। সত্যি অনেক কিছু আজকাল রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে অবাধে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তার মানেই কি সবকিছু যাচ্ছে? সব মানুষ যাচ্ছেন? খুব সহজে? সব সীমান্ত কি সত্যিই একেবারে ভেঙে পড়ছে? না কি কিছু যেমন ভাঙছে, কিছু তেমন আবার নতুন করে মাথাও তুলছে? আর দ্বিতীয়ত, যখন কোনো কিছুর থাকা না থাকা নিয়ে আমরা এতটাই মাথা ঘামাচ্ছি, তখন নিশ্চয়ই আমাদের মাথায় সেটা থাকা ঠিক না বেঠিক এ নিয়েও একটা ধারণা আছে, তাহলে সেই ধারণাটাই বা কী? রাষ্ট্র থাকা ভালো? না ভালো না?

আমাদের অভিজ্ঞতায় রাষ্ট্রকে আমরা দেখি একটা দেশের বাসিন্দাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনগুলোকে কিছু আইন কানুনের মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার একটা রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে। এই নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা আর ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, সব নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোকে সুনিশ্চিত করা, সবার জন্য প্রাথমিক সেবা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা—সাধারণ ধারণায় এ সবই রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্রের আরেকটা মূল কাজ হলো বাইরের জগতে একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করা এবং বিশ্বস্তরের বিভিন্ন মঞ্চে নিজের দেশের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করা। এই স্বার্থরক্ষার খাতিরে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যও তৈরি থাকতে হয়।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য কোনো দিনই ছিল না। রাজনীতি হোক, বাণিজ্য হোক—সবেতেই উন্নত দেশগুলো বিভিন্নভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর ছড়ি

ঘুরিয়ে গেছে। সবসময়ই বেশির ভাগ রাষ্ট্রকে বাস করতে হয়েছে কোনো আরো বড় ক্ষমতার ছায়ায়। আজ বিশ্বায়নের দুনিয়ায় এসে আমরা দেখছি যে এই ক্ষমতার ছায়াগুলোর চেহারা কিছুটা বা অনেকটাই পাল্টাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে আসল ক্ষমতাধর হলেন বিশ্ব বাজারের নিয়ন্ত্রাশক্তিগুলো, মানে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা ইত্যাদি। এখন তাদের তুলনায় রাষ্ট্রশক্তি কী রকম পানসে আর মিয়োনো মতো হয়ে যাচ্ছে, সেই গ্ল্যামার আর নেই। আমাদের দেশেও আমরা দেখছি সরকার বড় বড় ব্যবসাদারদের দ্বারস্থ হচ্ছেন, আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও বলা হচ্ছে যে আমাদের উন্নতি নির্ভর করছে আমরা নিজেদের বিশ্বায়িত বিনিয়োগের পক্ষে কতটা উপযুক্ত করে তুলতে পারি তার ওপরে।

চারদিকে একটা হাওয়া উঠেছে যে ঐ ব্যাটা রাষ্ট্রই সব গণ্ডগোলের মূল, কে বলেছিল রাষ্ট্রকে সবকিছুতে নাক গলাতে, সেই করতে গিয়েই তো সব ডুবলো, ধর ব্যাটাকে, মার ব্যাটাকে, দে ব্যাটাকে ডিস-ইনভেস্ট করে। চারদিকে পিলপিল করে সব বিশেষজ্ঞরা বেরিয়ে পড়েছেন, তাঁদের মুখে এক কথা—রাষ্ট্রের উচিত সব রকমের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিষেবা, শিল্পোৎপাদন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা থেকে সরে এসে নিজের কাজে মন দেওয়া। নিজের কাজটা কী? আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশটা যাতে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ব বাজারে লড়ে খেতে পারে সেই পরিবেশ বাঁচিয়ে রাখা। ওপর ওপর দেখতে গেলে কথাটা ঠিক মনে হয়, আমাদের অভিজ্ঞতাও তো বলে যে রাষ্ট্রের অনেক গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু রূপায়ণে

দোষত্রুটি, চুরিচামারি, সুবিধাবাদ থাকা সত্ত্বেও একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে আদর্শ ছিল, সব মানুষের সমান নাগরিক অধিকারের যে স্বীকৃতিটুকু ছিল (সেটা কোথাওই বাস্তবায়িত না হলেও), এঁরা সেটাতেই গোড়ায় কোপ মারতে চাইছেন। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক। আমাদের সরকারি হাসপাতালে খুব কম খরচে চিকিৎসা পাওয়ার কথা। অভিজ্ঞতা বলে সবসময় এমনকী অধিকাংশ সময়েই আমরা সেটা পাই না। অতএব উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তরা চাইছেন যে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণ হোক, যাতে ভালো চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রশ্ন হলো, যে মানুষের এই চিকিৎসার খরচ দেওয়ার ক্ষমতা নেই তিনি কী করবেন? ওঁরা বলবেন এমনিতেই তো সরকারি হাসপাতালগুলো অপদার্থ, কাজেই এই প্রশ্নটারই কোনো মানে হয় না। কিন্তু আসলে প্রশ্নটা আরো গভীর একটা প্রশ্ন। বহু যুগ ধরে মানুষ একটা আরো ভালো সমাজের খোঁজে হাঁটতে হাঁটতেই আজকের রাষ্ট্রে পৌঁছেছিল। আমাদের ধারণা ছিল যে আমাদের রাজনৈতিক নাগরিকত্ব আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার প্রহরী হবে। একজন ভারতীয় হিসেবে আমি চিকিৎসা পাব কিনা সেটা আমার চিকিৎসা কেনার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে না। কারণ তাই যদি করে, তবে আমার রাজনৈতিক নাগরিকত্বের কোনো মানে থাকে না, আমার মৌলিক অধিকারের ধারণার কোনো মানে থাকে না। এই রাজনৈতিক বিশ্বাসের জমিটুকু থাকলে অন্তত রাষ্ট্রের অক্ষমতা বা শয়তানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যায়। আমরা যদি কেবল যে কিনতে পারে সেই কিনবে—এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ি তবে তো রাজনৈতিক নাগরিকত্বের মূল অধিকারকেই বিসর্জন দেওয়া হবে। সেটা তো অধিকাংশ মানুষের পক্ষে আরো ক্ষতিকর হবে, এখন তাও যেটুকু ঝগড়া করা যায়, দাবি করা যায়, তখন তো তাও যাবে না। রাষ্ট্র যদি তার কাজ ঠিকমতো না করে, তবে তার দায়িত্বগুলো নিয়ে বাজারের বিকিকিনির মধ্যে ফেলে দিলে অধিকাংশ মানুষের দশা আরো খারাপ হবে। সত্যিকারের সমাধান হলো রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে পারার মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা, সেটা অবশ্য বাজারের স্বার্থের পরিপন্থী।

রাষ্ট্র বনাম কমিউনিটি: আমাদের চারপাশে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিয়ে যে আলোচনা তার আবার অনেকগুলো দিক আছে। আমাদের মতো দেশে রাষ্ট্রক্ষমতার যে গঠন আমরা দেখি তার ধরনটা খুবই কেন্দ্রীভূত। কোনো কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অনেকটাই দিল্লির হাতে থাকে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হাতে থাকে। সাধারণ মানুষদের কাছে এই দূরত্বগুলো বড় বাধা হয়ে ওঠে। একজন এম পি অথবা এম এল এ সাধারণত বহু মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন বলে আঞ্চলিক সমস্যা তাঁর নজরে আনতেই বহু সময় লেগে যায়। তিনিও যে এলাকায় তাঁর ভোট বেশি সেই এলাকাকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। তারপর আমলাতন্ত্রের লাল ফাঁস তো আছেই। ইদানিং

আমরা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথাটা খুব শুনছি। এ ব্যাপারে আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালা অন্য প্রদেশের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সফল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখন স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের একটা মডেল হয়ে উঠেছে। কিছু আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। প্রচুর অনুদানও আসছে। বিদেশি অনুদান এলেই তাতে আমরা চক্রান্তের গন্ধ খুঁজি না। আমরা বিশ্বাস করি এই সাহায্যের পেছনে সব সময়ই অসৎ উদ্দেশ্য থাকবে এ কথার কোনো মানে নেই। আমরা যত দূর সম্ভব স্থানীয় স্তরে মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকায় বিশ্বাসী। সমস্যাটা হলো, কোনো কাঠামোকেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে এই কাঠামোগুলো সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধী না হয়ে ওঠে। কেন বলছি আমরা এই কথাগুলো?

মানুষের ইতিহাস আজও কোনো আদর্শ শাসনের কাঠামো খুঁজে পায়নি। বহু অভিজ্ঞতা, বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা গণতন্ত্রকে বেছে নিয়েছি উপনিবেশবাদ, রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন ইত্যাদি অন্যান্য শাসনের কাঠামোগুলোর তুলনায় ভালো বলে। এই বোধ বা অধিকার সহজে আসেনি, বহু প্রাণ গেছে। অনেক সময় অনেকেই খানিকটা হয়তো হাল্কা ভাবেই বলেন, 'বাবা, এর চেয়ে হিটলারি শাসন ভালো ছিল।' কিন্তু আমরা আসলে জানি সেটা সত্যি নয়। হাজার দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্রের উন্নততর বিকল্প এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তেমনি ভাবে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্তরে আমাদের স্বার্থ দেখবে এটাই আমরা চেয়েছিলাম। হয়তো সেটা হয়নি। দুর্নীতি হোক, দুর্বলতা হোক, রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের শ্রেণীস্বার্থে হোক, অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ অধিকাংশ সময়ই তাঁরা দেখেননি। কিন্তু তার বিকল্প কি আমাদের স্থানীয় সমাজগুলোকে সরাসরি ভাবে বিশ্ব বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া? যে বাজারের নির্দয় লোভের কথা প্রমাণিত, সে কি আমাদের গরিব মানুষদের সঙ্গে কোনো সৎ বন্দোবস্তে আসবে, না কি গায়ের জোর দেখিয়ে যত পারে লুঠে নেবে? একটা স্থানীয় এলাকার মানুষ কিসের জোরে বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে লড়বেন? প্রতি মুহূর্ত রুটি রুজির চিন্তায় আত্মসমর্পনে বাধ্য হবেন না কি? এই নিয়ে কি ভাবা দরকার নয়? বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি সংস্থা রাষ্ট্রকে পাশ কাটাতে এত আগ্রহী কেন? এই প্রশ্ন আমাদের করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতা বলে গ্রাম পর্যন্ত একদলীয় শাসন শিকড় গেড়েছে। এই অবস্থায় স্থানীয় স্তরে কারো দাবি মানা হবে কি না সেটা তার রাজনৈতিক আনুগত্য অনুযায়ী ঠিক হওয়ার বিপদ থেকেই যায়। সেটা কী খুব কাম্য? আমরা অবশ্যই বলছি না যে এর জন্য পঞ্চায়েত বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা চাই না। কিন্তু আমরা বলছি যে এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। কীভাবে স্থানীয় শাসনকে গণতান্ত্রিক রাখা যায় তা ঠিক না করলে কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থা একটা দম আটকানো অন্যায্য ব্যবস্থায় পরিণত হবে।
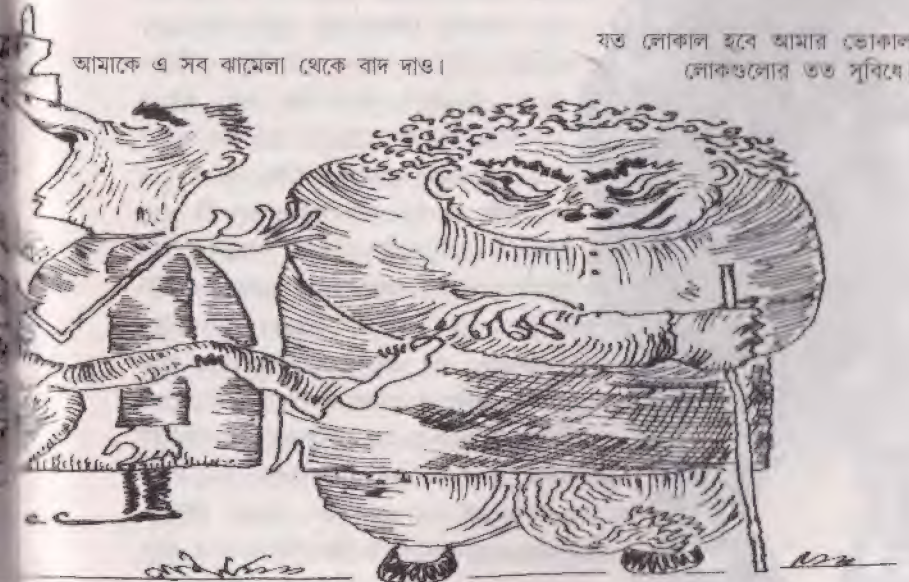
সন্ত্রাস ও বিশ্বায়নঃ গত কিছুদিন ধরে, বিশেষ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য লক্ষ্যে আক্রমণের পর থেকে আমরা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস বিষয়টা নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে পড়েছি। আমরা যদি অভিধানে মানে খুঁজি, দেখব সন্ত্রাস মানে অতিশয় ভয়। এই মানে ধরে যদি আমরা এগোই দেখব সন্ত্রাস হলো ভয় দেখানোর জন্য জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি করার একটা উপায়। কিন্তু কোনো ঘটনাকে সরাসরি সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত করতে আমাদের অসুবিধে হয়। কারণ এর পেছনে সাধারণত একটা ন্যায় অন্যায়ের বোধকে নিয়ে আসা হয়। যেমন, কাশ্মীরি জঙ্গিরা যদি মানুষ মারে, বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, তাকে আমরা সন্ত্রাস বলে সঙ্গে সঙ্গে চিনে নিতে পারি। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীও তো জঙ্গিদের দমন করতে গিয়ে অনেক সময়ই ভয় দেখানোর জন্য অনেক কিছু করে, সেগুলোকে আমরা সবাই সন্ত্রাস বলে মনে করি কি? নকশালপন্থী জনযুদ্ধ গোষ্ঠী যখন মানুষ মারেন বা সম্পত্তি পোড়ান তাকে সন্ত্রাস বলা হয় কিন্তু পুলিস বা মিলিটারি যখন নকশাল দমনের নামে গ্রামে গ্রামে মারধোর ধরপাকড় করে তখন তাকে সন্ত্রাস বলি কি? এর মানে এই যে সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস বলে চিনতে হলে, কে করছে তাই দিয়ে ঠিক না করে, ভয় দেখানোর উপায়গুলোকে, ঘটনাগুলোকে বিচার করতে হবে।

এই সন্ত্রাস এখন বিশ্বায়িত হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে, সবচেয়ে বেশি বলছেন আমেরিকা। তাঁরা বিশ্ব জুড়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ নতুন কিছু নয়। তাঁদের কাজটাকে যদি আমরা সন্ত্রাস মনে করি তাহলে এই ইতিহাস পুরোনো। কিন্তু এখন যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো আমরা দেখছি তার চরিত্রে একটা বড় পার্থক্য আছে। এই সংগঠনগুলোর কোনো কেন্দ্র সেভাবে নেই। সংগঠনগুলোই বিশ্ব জুড়ে ভাসমান, তাই তাদের ধরা মুশকিল। এই ধরনের সংগঠন সম্ভব হচ্ছে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসাদে। সংকেতের যোগাযোগের জন্য ই-মেল, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট ট্র্যান্সমিশন, ফ্যাক্স, ভিডিও, টেলিভিশন, আর মানুষ বা মাল চলাচলের জন্য এরোপ্লেন, জাহাজ, ট্রাক—বিশ্বায়নের জন্য বাজার যে পথগুলো ব্যবহার করে,

সন্ত্রাসবাদীরা এক শক্তিশালী পরগাছার মতো ঠিক সেগুলোই ব্যবহার করে বলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নকে বানচাল না করে দিয়ে এদের আটকানো খুব মুশকিল।

এক দেশ থেকে অন্য দেশে সন্ত্রাস ছড়ানোও নতুন কিছু নয়। ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয় যে এদের দেশের ইতিহাসটাই ঘটেছে অন্য দেশে—মানে উপনিবেশগুলোতে। অর্থাৎ নির্মম শোষণ, গণহত্যা, দাস পাচার, এসব অসভ্যতা বাইরে করে দেশের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটানো গেছে। গত শতাব্দীতে আমেরিকার উত্থানও কিন্তু একই রকম রক্তাক্ত। হিরোসিমা, ভিয়েতনাম, লাওস, সুদান, আফগানিস্তান, ইরাক তার সন্ত্রাসের চেহারা চেনে, চেনে চিলি, ইন্দোনেশিয়া এবং আরো বহু দেশ। এবার সে সন্ত্রাস খোদ আমেরিকায় পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ তার গতিমুখ আর একমুখী নেই। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর আমেরিকার সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ এই সন্ত্রাস ব্যাপারটাকে একটা অভূতপূর্ব বিশ্বায়িত চেহারা দিচ্ছে। কয়েকদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল যে ইরাকের জঙ্গিরা হুমকি দিয়েছে তিনজন ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভারকে তারা মেরে ফেলবে—এঁদের অপরাধ হলো এঁরা একটি কুয়েতী কোম্পানিতে কাজ করেন। ইরাক থেকে যদি ঐ কুয়েতী কোম্পানি কাজকর্ম গুটিয়ে অবিলম্বে চলে না যায় তাহলে ঐ ট্রাক ড্রাইভারদের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়া হবে বলে শাসানো হচ্ছে। এখন ঐ বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে দর কষাকষি চলছে। আমরা কি এই বিশ্বায়নকে স্বাগত জানাব? না। অবশ্যই না। বিভিন্ন দেশে আমেরিকার ভূমিকার সমালোচনা করেও বলা দরকার যে এই নতুন সন্ত্রাসও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সব সন্ত্রাসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ। (*প্রসঙ্গ সন্ত্রাস* নামে এই সিরিজের দ্বিতীয় বইটাতে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।) হিংসার রাজনীতি কখনই ভালো কিছু করতে পারে না। সে হিংসা যেই করুক না কেন।

বিশ্বায়ন ও মেয়েরা

মেয়েরা পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক। তবু আজ ২১ শতাব্দীর গোড়ায় বসেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে অন্য সব অবস্থান সমান হলে শুধু মেয়ে বলেই মেয়েরা সব সময়েই ছেলেদের তুলনায় অসুবিধের জায়গায় থাকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পারি যে আজও পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই—ইউরোপ, আমেরিকার মতো তথাকথিত উন্নত দেশ ধরেও—যেখানে মেয়েরা ছেলেদের সমান অধিকার ভোগ করে। বহু ক্ষেত্রে কাগজে কলমে অধিকার দেওয়া থাকলেও বাস্তবে সমাজ সেগুলো মানে না।
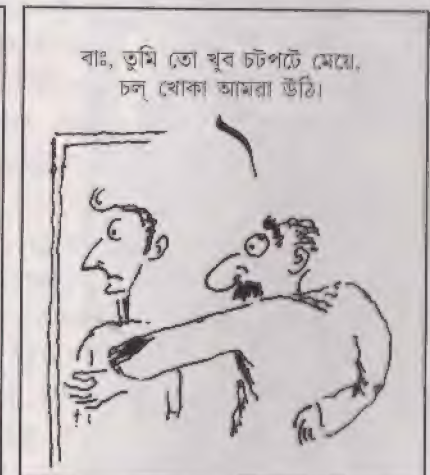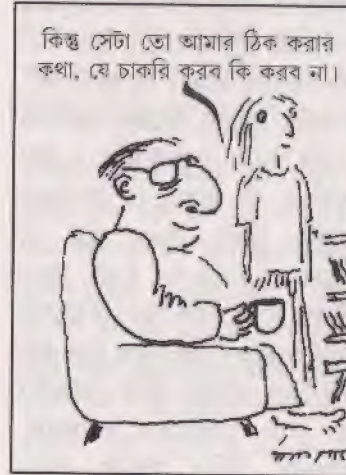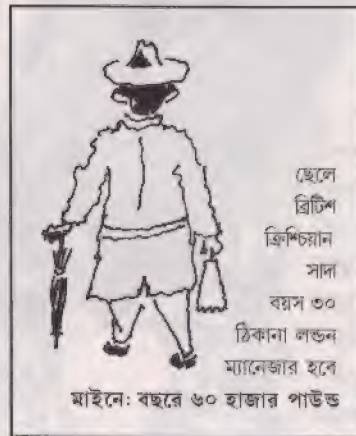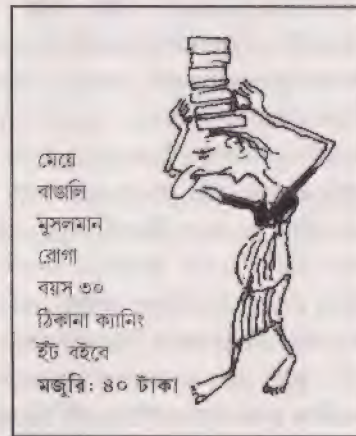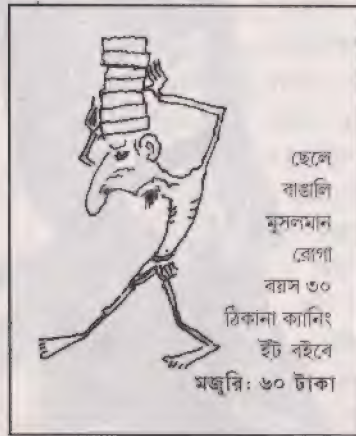
বহুদিন থেকে মেয়েদের সমানাধিকারের আন্দোলন চলছে। আজ যে মেয়েরা পথে ঘাটে বেরুচ্ছেন, চাকরিতে যাচ্ছেন, ভোটের অধিকার পাচ্ছেন, পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন, মনে রাখা দরকার এই সুযোগ একদিনে অর্জিত হয়নি। আজকে আমরা যারা টেলিভিশন দেখি, খবরেরকাগজ পড়ি বা কোনো বড় বা ছোট শহরের কাছাকাছি বাস করি, তারা ভাবতেই পারি, এই যে শুনছি মেয়েরা এখনো অনেক অধিকারের জন্য লড়াই করে চলেছেন, সমাজে মেয়েদের অবস্থা ভালো না, সেটা আমি কী করে বুঝব? আমি তো দেখি কলেজে অনেক মেয়ে যাচ্ছে, কত কাজ মেয়েরা করছে, আর বিজ্ঞাপনে তো প্রায় শুধুই মেয়েদের ছবি! তাহলে? প্রশ্নটা খুবই জরুরি, তাই এটার উত্তর দেওয়া দরকার।

উৎপাদনে অংশগ্রহণ : বড় বড় কলকারখানা তৈরি হওয়ার আগে গ্রামে নানান কাজের জিনিস তৈরি হওয়ার সময় বা চাষের কাজে মেয়েরা পুরুষের সমান বা বেশি অংশ নিতেন। আমরা আজও দেখি গ্রামের মেয়েদের—কী আশ্চর্য পরিশ্রমে তাঁরা বাড়ির কাজ, মাঠের কাজ, বাচ্চাদের দেখাশোনা সবই এক হাতে সামলে চলেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন যখন বড় বড় যন্ত্রভিত্তিক, বড় বিনিয়োগনির্ভর হয়ে পড়ে, বাড়ি থেকে দূরে বড় বড় কলকারখানা এবং অফিস কাছারি যখন মূল কাজের জায়গা হয়ে ওঠে, এই উৎপাদনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ততই কমে আসে। এ রকম একটা ভাব চালু হয়ে যায় যে এসব ভারী কাজ মেয়েদের জন্য নয়। এবং আমাদের আধুনিক শিক্ষার যে প্রসার ঘটে, যেমন এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি, তাতেও মেয়েদের প্রবেশাধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে। এ কথা মনে রাখা দরকার এই কারণে যে সাধারণত আমাদের একটা ধারণা দেওয়া হয় যে আধুনিকতা মেয়েদের ঘরের বার করছে, আগে মেয়েদের বন্দীদশা আরো বেশি ছিল। ইতিহাসটা অত সরল নয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে এসে আমরা দেখছি, এক ধরনের কাজে মেয়েদের ডাক পড়ছে। জামা সেলাইয়ের কারখানায়, জুতোর কারখানায়, ঘড়ির যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়ার কাজে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি কাজ পাচ্ছেন। বরাবরই মেয়েরা যে কাজে মজুরি পাওয়া যায় না সেই কাজ করে এসেছেন। যেমন বাড়িতে জামা সেলাই করেন মেয়েরা, প্রফেশনাল দর্জি মানেই পুরুষ। বাড়িতে রান্না করেন মেয়েরা, হোটেলে বাবুর্চি মানেই পুরুষ। তাহলে আজ যে ডাক আসছে তাকে কী আমরা মেয়েদের মুক্তির সম্মানের প্রমাণ হিসেবে দেখব? এত তাড়াতাড়ি নয়। দেখা যাক মেয়েদের এই কাজ পাওয়ার

কারণগুলো কী। আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে বিশ্বায়নের মূলমন্ত্রই হলো মালিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য মুনাফা বাড়ানো। মেয়েদের ব্যবহার করতে পারলে এই মুনাফা বাড়ে। কারণ :

- মেয়েদের মজুরি এখনো ছেলেদের চেয়ে কম।
- ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির অভিজ্ঞতা কম থাকার ফলে মেয়েদের বেশি শোষণ করা যায়।
- গরিব পরিবার মেয়েদের ঘাড়ে এসে পড়ে, পুরুষ অনেক সময়ই বাচ্চাকাচ্চা রেখে বেপাত্তা হয়ে যায়, পরিবার বাঁচানোর দায়ে মায়েরা খুব খারাপ শর্তেও কাজ নিতে বাধ্য হন।
- এখন যন্ত্রের খুব উন্নতি হওয়ার ফলে বড় ভারী কাজ অনেকটাই যন্ত্র করে দেয়, বাকি থাকে সূক্ষ্ম কাজ, যেগুলো সাংঘাতিক ধৈর্য ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা এক জায়গায় বসে করে যেতে হয়। আমাদের সমাজে এই কাজ করে চলার ট্রেনিং একজন ছেলের তুলনায় একজন মেয়ের অনেক বেশি।

আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের নিজেদের শ্রমকে শ্রম বলে মনে না করার, মুখ বুজে কাজ করে যাওয়ার সামাজিক শিক্ষাকে এখন বাজার কাজে লাগাচ্ছে, তাঁদের শোষণ করে নিজের মুনাফা বাড়াচ্ছে। এতে মেয়েদের শুধুই ক্ষতি হচ্ছে কি? এরও কোনো সরল উত্তর নেই। লাভক্ষতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওরকম সহজভাবে মাপা যায় না। আমাদের মনে রাখতে হবে বাজার যদি মেয়েদের শোষণ করে, অন্য যে অবস্থাটা অর্থাৎ পরিবার, সেখানেও মেয়েদের জীবন অনেক ক্ষেত্রেই খুব সুখের কিছু নয়। সেখানেও বছরের পর বছর কোটি কোটি মেয়েকে ন্যূনতম মর্যাদা ছাড়া, কাজের মূল্য ছাড়া এক ধরনের বন্দীজীবন যাপন করতে হয়, অনেক সময়ই দুর্বিষহ দারিদ্র্যের মধ্যে। বাজার এখানে অনেক মেয়েকেই একটা দমবন্ধ পরিবেশ থেকে বেরুতে সাহায্য করছে, শত কম হলেও

নিজের কাজের একটা দাম আছে—এই বোধটা দিচ্ছে। একটা স্বাধীন রোজগার দিচ্ছে। এরও কিন্তু একটা দাম আছে। এটা আমাদের বুঝতে হবে।

অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে, বাজারে চাকরি করতে আসা মেয়েরা আবার কাজ ছেড়ে সংসারে ফিরেও যাচ্ছেন। তারও অনেক কারণ। ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে না পারায় সামাজিক তিরস্কার শুনতে হচ্ছে, কাজের জায়গায় যৌন অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে, পরিবার যেটুকু সামাজিক সুরক্ষা দেয় সেটাও মিলছে না। আবার অনেক দেশে কাজ করতে আসা মেয়েদের ওপর সংগঠিত আক্রমণ হচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় মেয়েদের কাজে নিয়ে যাওয়ার বাসে উঠে অ্যাসিড মারা বা খুন করার ঘটনা বেশ নিয়মিতভাবে ঘটে থাকে।

কাজের সুযোগ : ধনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে যে বিশ্বায়ন চলছে তার প্রচার আমাদের এই ধারণা দেয় যে এর মধ্যে দিয়ে প্রচুর কাজের সংস্থান হচ্ছে। এই বইয়ের গোড়াতেই আমরা দেখেছি যে কথাটা ঠিক নয়, আসলে সকলেরই কাজ কমছে। এখনো পৃথিবীর যে কোনো সমাজে কাজ কমলে তার সবচেয়ে বেশি ধাক্কা সামলাতে হয় মেয়েদের, কারণ পরিবার আর শিশুদের দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হয়। কাজেই পুরুষদের কাজ চলে গেলেও তার চাপটা এসে মেয়েদের ওপরেই পড়ে। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই চাষের কাজ করেন। কাজেই শহরে কয়েক হাজার মেয়ের কাজ হলে খুব বেশি দূর বদল হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৯৯১ সালে ২৬.৮ শতাংশ মেয়ে শ্রমিক খেতমজুরের কাজ করতেন, যেটা ২০০১ সালে বেড়ে হয় ৩২.৪ শতাংশ। আমরা জানি যে অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ যত কমে আসে ততই মেয়েরা শেষ অবলম্বন হিসেবে খেতমজুরের কাজকে আঁকড়ে ধরেন। আমরা এটাও দেখছি যে ১৯৯১ সালে গ্রামীণ ভারতে মেয়েদের মোট সংখ্যার ১৮.৬ শতাংশ উপার্জনশীল কাজ করতেন, যেটা ২০০১ সালে কমে গিয়ে হলো ১৬.৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালে গ্রামীণ বাংলার মেয়েদের মোট সংখ্যার ৮.৭ শতাংশ উপার্জনশীল কাজ করতেন কিন্তু ২০০১ সালে সেটা কমে হয় ৫.৮ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্বায়ন মেয়েদের জন্য নতুন বিশাল সম্ভাবনা সৃষ্টি করছে, এ দাবি ধোপে টিকছে না।

বিজ্ঞাপনের মুখ: ধনতন্ত্রের নেতৃত্বে যে বাজারকে আমরা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখছি, সেখানে মেয়েরা কেবলমাত্র শ্রমিক হিসেবেই আসছে তাও কিন্তু নয়। ক্রেতা হিসেবে মেয়েরা একেবারে সামনের সারিতে চলে এসেছে। চারদিকে বিজ্ঞাপনে শুধু মেয়েদের মুখ। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের মুখ দেখানো নতুন কিছু নয়। পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বহুদিন ধরেই মেয়েদের যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা হয়ে এসেছে। কিন্তু এবার যেটা নতুন সেটা হলো মেয়েদের এখন মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জনাই ব্যবহার করার দরকার হয়ে পড়েছে।

মেয়েরা এভাবে ক্রেতা হয়ে উঠল কী করে? আমাদের মনে হয় কারণটা মূলত দুটো। একথা সত্যি যে আমাদের দেশে মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ বেড়েছে, চাকরি বাকরির সুযোগ বেড়েছে। সব মেয়েরা না হলেও, অধিকাংশ মেয়ে গরিব বলে এই দুনিয়ায় ঢুকতে না পারলেও এবং পুরুষদের তুলনায় অনেক কম হলেও আমাদের দেশে বহু লক্ষ কিংবা কোটি মেয়ে পড়াশোনা করেছে, চাকরিতেও ঢুকেছে, তাদের হাতে একটু পয়সাও এসেছে, কিছুটা খরচের স্বাধীনতা এসেছে। কীসের ওপর খরচ করা যাবে সেটা ঠিক করারও স্বাধীনতা এসেছে। এর পাশাপাশি সমাজে একটা আধুনিকতার ধারণা ছড়িয়ে পড়ায় ফ্যাশন, প্রসাধনের ওপর খরচ করার একটা সামাজিক স্বীকৃতি তৈরি হয়েছে। আমাদের প্রাচীন ঘরে তৈরি রূপটানের ফরমূলা অচল হয়ে এখন পশ্চিমী বা ব্র্যান্ডেড আয়ুর্বেদিক জড়িবুটির বাজার তৈরি হয়েছে। এসব মিলে মেয়েরা শ্যাম্পু, পাউডার, পারফিউম, ক্রিমের কোটি কোটি টাকার বাজারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ক্রেতা হিসেবে মেয়েদের এটাই একমাত্র ভূমিকা নয়, প্রধান ভূমিকাও নয়। আরেকটা লম্বা ইতিহাস ছোট করে হলেও আমাদের আলোচনা করতে হবে। বিয়েতে মেয়েদের প্রধান ভূমিকা ছিল প্রজননের ক্ষেত্রে। মেয়েরা পেটে বাচ্চা ধরবে, পরবর্তী প্রজন্ম আসবে। ধনতন্ত্র যত এগোল, আমাদের পরিবারের চেহারা বদলাতে বদলাতে আমরা যাকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বলি তাতে এসে ঠেকেছে। এর মানে বাবা-মা-সন্তান নিয়ে একটি পরিবার, যৌথ পরিবার নয়। পরিবারের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ বরাবরই ছিল, আজও আছে, সেটা হলো একটা বাচ্চাকে বড় করে বাজারের কাছে পাঠানো। যে গরিব পরিবারে শিশুরাই শ্রমিক হয়ে যায় সেখানে পরিবারের এই দায়িত্বের সময়টা কম। পাঁচ সাত বছর বয়সেই শিশু বাজারে চরে এবং করে খেতে শুরু করে। মেয়ে শিশু হলে ঘরের শ্রমে লেগে পড়ে আরো আগে। কিন্তু আমাদের বাজারের মূল লক্ষ্য যে কোটি কোটি মধ্যবিত্ত সেখানে বাচ্চার বড় হয়ে বাজারে আসার এই সময়টা আরো অনেক লম্বা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একজন ছেলে কিংবা মেয়ের বাজারে কাজ খুঁজতে আসার বয়স অন্তত ষোলো কী আঠারো, উঁচু চাকরির উঁচু যোগ্যতা খুঁজতে

যখন কোনো স্বামী-স্ত্রী ও তাদের ছেলেপুলে স্যামসুং ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচে, ন্যাশনাল মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করে, সোনি ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভিতে সিরিয়াল দেখে, হকিন্স প্রেশার কুকারে ইন্ডেন গ্যাসের সিলিন্ডার জ্বালিয়ে কুকমি গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভেনকিজ চিকেন রান্না করে, পেপসি খেতে খেতে মারুতি চড়ে রবিবার নিকোপার্ক বা অ্যাকোয়াটিকা যায়, বিগ বাজারে বা প্যান্টালুন্সে বাজার করে এবং এশিয়ান পেন্টস দিয়ে ঘর রঙ করে তখন তাদের পরিবার বলে।

গেলে আরো অনেক বেশি। এই বয়স পর্যন্ত তাকে নাইয়ে খাইয়ে পড়িয়ে বড় করার দায়িত্ব অবশ্যই পরিবারের। আজ আরো বেশি বেশি করে এই দায়িত্ব মায়ের ওপর এসে পড়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে যত মেয়ে ইস্কুল কলেজে পড়েছেন তাঁদের খুব কম অংশই চাকরি বাকরিতে ঢুকেছেন, অধিকাংশই বিয়ে করে পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর এই শিক্ষিত মায়েদের কাজই হচ্ছে ছেলেমেয়েকে চাকরি বাকরির (মেয়েদের ক্ষেত্রে ভালো বিয়ের) জন্য তৈরি করা। অর্থাৎ শুধু আর শারীরিকভাবে সন্তান প্রসব করলেই হবে না, তাকে বুদ্ধিসুদ্ধিতে উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্বও মায়েদের। আর এর জন্য শুধু বাচ্চার জিনিস নয়, পরিবারমঙ্গল কাব্যের নায়িকা হয়ে উঠেছেন এই মায়েরা, আর বলা বাহুল্য, পরিবারের মঙ্গল মানেই নানান জিনিস। এই কারণে আজ বিজ্ঞাপনে মেয়েদের মায়েদের ছবির ছড়াছড়ি। কারণ পরিবারমঙ্গল মানে যে বহু কোটি টাকার বাজার।

যখন কোনো মহিলা ছেলেমেয়েদের হরলিকস খেতে দেন, চুলে সানসিল্ক শ্যাম্পু লাগাতে দেন, লাক্সর পেন দিয়ে লিখতে শেখান, ক্যাডবেরিজ চকোলেট খেতে দিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকেন, চোখ ঠিক রাখার জন্য এল জি টেলিভিশন ছাড়া দেখতে দেন না, বাচ্চার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে টাকা জমান, ফেভিকল দিয়ে হোমওয়ার্ক আটকাতে দেন এবং বাচ্চার সব বন্ধুকে দু মিনিটে ম্যাগি খাইয়ে দেন তখন তাঁকে মা বলে। মা হওয়া তাই সহজ নয়।

দারিদ্র্য ম্যানেজমেন্ট : আমরা দেখেছি যে বাজারকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের পেছনে যাঁরা বড় শক্তি তাঁরা চান রাষ্ট্র জনজীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকেই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে হাত গুটিয়ে নিক। তাঁদের বক্তব্য মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থরক্ষার প্রবৃত্তিকে যদি স্বাধীনভাবে বাড়তে দেওয়া যায় তবে মানুষ উদ্যোগী হবে, রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে, সমাজ স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে। এই কারণে জনগণ ও শিল্পপুঁজির মধ্যে নতুন সন্ধির কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি। তার মূল বক্তব্য হলো রাষ্ট্রের ছত্রচ্ছায়া থেকে বেরিয়ে পুঁজি ও জনগণের যৌথ উদ্যম তৈরির চেষ্টা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে খুব মাতামাতি চলছে। যেন হঠাৎই বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বড় বড় উন্নয়ন সংস্থার বড়সাহেবরা ধরতে পেরেছেন যে মেয়েদের হাতেই আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। পৃথিবীর কোটি কোটি সংসারে হাল ধরেন মেয়েরাই। মাইল মাইল জল টেনে, শাকপাতা সিদ্ধ করে, নুনপান্তা খাইয়ে বাচ্চাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখেন। একটু জমি পেলে দুটো শাক ফলান, একটু জল পেলে মাছ ছাড়েন, কী না করেন দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যেও সংসার চালানোর জন্য। স্বামীটা ভালো হলে তো খুবই ভালো, কারণ অনেক সময়ই তো তিনি মাতাল হয়ে পয়সা উড়িয়ে দেন, বা কাজের খোঁজে কোথায় চলে গিয়ে মাসের পর মাস নিখোঁজ থাকেন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সংস্থারা এখন মেয়েদের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সমাজের উন্নয়নের পথে এগোতে চাইছেন। প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী চালু হয়েছে।

যুগ যুগ ধরে মেয়েদের এই ভূমিকাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, এবং এই লড়াকু মেয়েরা যেখান থেকে যেটুকু সাহায্য বা স্বীকৃতি পান তাকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের ভয়টা অন্য। আমাদের ভয় এই যে, এইভাবে মেয়েদের ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়ে এমন একটা ভাব করা হচ্ছে যে মানুষ নিজেরা উদ্যোগী হলেই সমাজ বদলে যাবে। সমাজের বড় অসাম্যগুলোকে ঠিক করার জন্য রাষ্ট্রের মতো বড় কাঠামো দরকার নেই। আমাদের মতে এটা একটা ভয়ংকর নীতি। কারণ এটা বাজারের প্রচারিত মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে মেয়েরা সবরকম মূলধন থেকে বঞ্চিত, তাঁরা কখনোই এই পথে এগিয়ে তিনটি মুরগি, চারটি নারকেল গাছের মালিক হওয়ার বেশি এগোতে পারবেন না। এই পথে কখনোই কোনো প্রকৃত অর্থে জীবন বদলানো যায় না, সামান্য রেহাই পাওয়া যায় মাত্র। সাময়িক সাহায্যের পথ হিসেবে এই পন্থা নেওয়া যেতেই পারে, কিন্তু একেই সমাজ বদলানোর পথ হিসেবে দেখা ও দেখানো লোক ঠকানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তো সেই ব্যবস্থাকেই চিরস্থায়ী করে যেখানে বড়লোকরা বড়লোকই থেকে যাবে, শোষণের কাঠামো নিয়ে কোনো কথা হবে না। খুদকুঁড়ো ম্যানেজ করে মায়েরা চালাবেন, আমরা হাততালি দেব।

প্রত্যক্ষ বিপদ: বাজারের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলো দিক থেকে মেয়েদের বিপদ প্রত্যক্ষভাবে বেড়েছে। ঘরে বাইরে মেয়েদের ওপর হিংসার ঘটনা বেড়েই চলেছে। আমাদের মতো দেশে কোন প্রত্যন্ত প্রান্তে কী ঘটছে সে বিষয় খবর রাখাও কঠিন। তবু প্রতিদিনই খবর পাওয়া যায় যে বাড়িতে মেয়েদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে, পথে-ঘাটে আক্রমণও বাড়ছে। কন্যাভ্রূণ নষ্ট করে ফেলাটাও আমাদের দেশের অনেক

মেয়েগুলো সব গেল কোথায়?

ভ্রূণেই খুন হয়ে গেছে

অঞ্চলেই খুব বেড়েছে। সরকারিভাবে এই কাজ অপরাধ বলে ঘোষণা করা হলেও খুব কমবে বলে মনে হয় না। বহু জায়গায়ই ব্যাঙের ছাতার মতো সোনোগ্রাফির যন্ত্র বসে গেছে, যাতে স্ক্যান করে বলে দেওয়া যায় গর্ভের ভ্রূণের লিঙ্গ কী। যদি ভাবি যে এই কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা গরিব ঘরেই কেবল হচ্ছে, তবে ভুল করব। উচ্চবিত্ত ঘরেও এ ঘটনা খুবই ঘটে থাকে। কলকাতা শহরে *দ্য টেলিগ্রাফ* পত্রিকা কিছুদিন আগে জনতাত্ত্বিক সতীশ অগ্নিহোত্রীর করা একটি সমীক্ষার রিপোর্ট-এর অংশ তুলে ধরে দেখিয়েছিল যে শহরের সম্ভ্রান্ততম অঞ্চলগুলোতেও পুত্রসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তানের জন্মের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাচ্ছে। রাজস্থান সহ কিছু রাজ্যে কন্যাজন্মের হার এইভাবে কমে গেছে। ফলে ছেলে মেয়ের সংখ্যায় অসাম্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে যা পরে খুব বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা তৈরি করবে।

মেয়েরা নিজের জোরে আজ পথে বেরিয়েছে। নতুন নতুন কাজে মেয়েরা অনেক সময় ছেলেদের পেছনে ফেলে কাজও পাচ্ছে। ফলে দেখছি পথেঘাটে হিংসা বাড়ছে। রাস্তায় ঘাটে কোনো কোনো পুরুষদের মধ্যে আলোচনা যদি কান পেতে শুনি, দেখি কী ভয়ংকর রাগ মেয়েদের ওপর। ট্রামে বাসে, ট্রেনে প্রায়ই এ ধরনের কথা শুনি যে মেয়েদের উচিত ঘরে থাকা, ওরা কেন বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, তার ফলেই তো সমাজের সর্বনাশ হচ্ছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের একটা অভ্যেস আছে এরকম কথা শুনলেই আমরা সেটার একটা ওপর ওপর চটজলদি সামাজিক ব্যাখ্যা করে এই রাগ যেন স্বাভাবিক, যুক্তিসঙ্গত এরকম একটা ভাব করি। যেমন, সত্যিই তো, আহা, ছেলেদের কাজ কমে যাচ্ছে, কাজেই রাগ হতেই পারে। এ কথা কিন্তু পুরুষদের বুঝে নিতে হবে যে স্রেফ ছেলে হওয়ার দৌলতে আমরা অন্যায়ভাবে মেয়েদের চেয়ে বেশি সুযোগ ভোগ করে এসেছি এবং আজও ভোগ করে চলেছি। এই নিয়ে মান অভিমানের কিছু নেই, পুরুষ জাত হিসেবে নিজেদের ভূমিকাটা বুঝে নিয়ে সেটার সংশোধন করাটাই আমাদের কাজ। এই রাগকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। মেয়েরা যদি কাজ পায় সেটা তাদের দোষ নয়, কাজ কমে যাচ্ছে বলে পুরুষের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে বলার কোনো মানে নেই। যেসব কারণের জন্য কাজ কমেছে, ছেলেমেয়ের সমান অধিকার স্বীকার করে নিয়েই তার অনুসন্ধানে নামতে হবে।

একদিকে মেয়েরা পুরুষের কাজের জায়গায় ভাগ বসাচ্ছে বলে রাগ, আবার অন্যদিকে পুরুষ ও পরিবারের সম্পদ বাড়াতে সাহায্য না করলে পুড়ে মরতে হচ্ছে মেয়েদের। পণপ্রথা এক ভয়ংকর জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে, অথচ এর বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত গণ আন্দোলন তেমন চোখে পড়ছে না। মেনে নেওয়া ভালো যে, যাঁরা সমাজ বদলের কথা বলেন, অনেক সময়ই তাঁদের বাড়িতেও সক্রিয়ভাবে পণপ্রথাকে মেনে নেওয়া হয়, এবং দাবি দাওয়া নিয়ে পুরোমাত্রায় অশান্তি করা হয়।
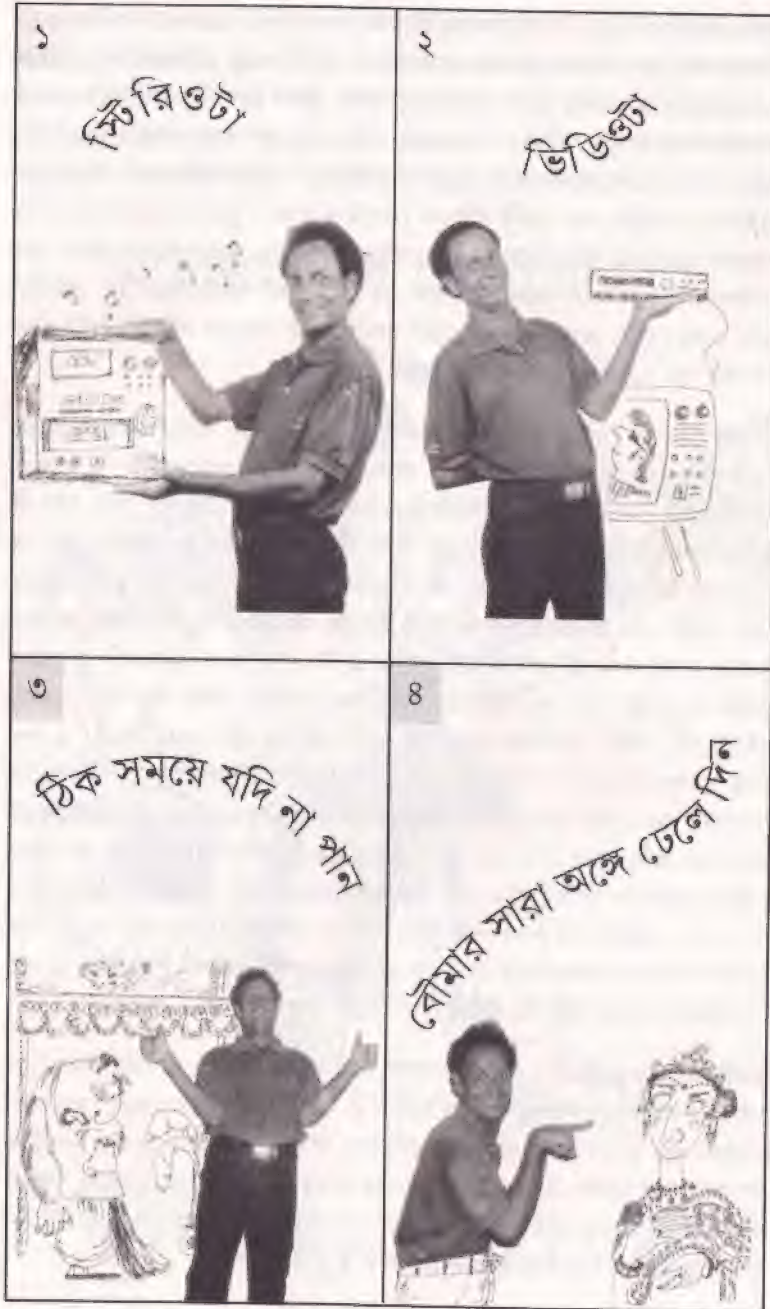
(বোরোলিনের বিখ্যাত জিঙ্গলের সুরে গাইতে হবে)

মডেল : রাজকুমার ফোটো : সুব্রত দাস

আমাদের চারপাশে পণ্যভিত্তিক সুখের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, আর ছেলে বা তার পরিবারের পক্ষে এই পণ্য বিনা খাটুনিতে সহজেই পাওয়ার উপায় হলো বিয়ে করে ফেলা। দোয়ানোর ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে গাড়ি, ফ্রিজ, টিভি, গয়না, ক্যাশ কতটা আদায় করা যাবে। বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপনে দেখবেন এইসব দামি পণ্য উপহার দেওয়ার ইঙ্গিত অতি স্পষ্ট। এর ফলে মেয়ে মানেই এক বিশাল খরচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা, মেয়েদের দায় বলে মনে করা এবং যে কোনো উপায়ে বিয়ে দিয়ে পার করে দেওয়া, এসব কিছু থেকে একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা বেরোতে পারছি না। আমাদের আলোচনার দিক থেকে সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে পণ্যভিত্তিক, বাজারভিত্তিক বিশ্বায়ন কোনো আধুনিক ধ্যান ধারণা এনে এই সামাজিক কুপ্রথাকে কমানো তো দূরস্থান, বাড়িয়ে তুলবার কারণ হয়ে উঠেছে।

আমরা আমাদের চারপাশে একটা খুব শক্তিশালী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার চেহারা দেখতে পাচ্ছি। গোটা গ্রহটাকে একটা ছাতার নীচে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। ধনতন্ত্রের স্বার্থে পুঁজি, শ্রম, কলকারখানা, বাজার পর্যন্ত মালপত্র পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত—সবকিছুকেই বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এত বড় করে বিশ্বজোড়া সংগঠন আমাদের ইতিহাসে আমরা আর দেখিনি। আমরা প্রশ্ন করতেই পারি—এই যে বিশ্বায়নের রূপ আমরা দেখছি, এটা কি অবশ্যম্ভাবী ছিল? এই বইয়ে আমরা সেই প্রশ্ন নিয়েও কিছুটা আলোচনা করেছি এবং দেখার চেষ্টা করেছি যে কী ভাবে পৃথিবীর ইতিহাসের পথ ধরে, উপনিবেশবাদ, ধনতন্ত্রের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক ধারণার আপাতত পিছু হটে যাওয়া, ক্রেতা নাগরিকদের উত্থান, সব মিলে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাজারের উল্লাস শুনতে শুনতে মনে হতে পারে যে এই বিশ্বায়নের কোনো বিকল্প হওয়া সম্ভব ছিল না, আজ তো আরোই নেই। বিশ্বায়নের সমর্থকরা ঘোষণা করছেন যে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। মুক্ত বাজারের মধ্যে দিয়েই মানব সমাজের আদর্শ বিকাশ ঘটা সম্ভব, আমরা সেই সত্যে পৌঁছে গিয়েছি, কাজেই আর সংঘর্ষ থাকবে না, দ্বন্দ্ব থাকবে না, অতএব ইতিহাসও থাকবে না। আমার কথাটি ফুরোলো, নটেগাছটি মুড়োলো। আমরা কিন্তু ঠিক উল্টো ছবি দেখছি, ইতিহাস ফুরিয়ে যাওয়া তো দূরস্থান, আমরা দেখছি এক নতুন ইতিহাস শুরু হতে চলেছে। কেন? তাহলে এবার সে কথাই আলোচনা করা যাক। আমরা আগেও বলেছি যে নিয়ন্ত্রণের যে কোনো প্রক্রিয়া সব সময়ই তার উদ্দেশ্য সাধনের বিপরীত ফলও সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই ঘটনা ঘটতে দেখছি। ধনতন্ত্র পৃথিবীকে এক করার চেষ্টা করছে যথাসম্ভব লাভ বাড়ানোর জন্য। এই কারণে পৃথিবী ক্রমশ অনেক দিক থেকেই ছোট হয়ে আসছে। কিন্তু এর ফলে আবার ধনতন্ত্র-বিরোধী শক্তিগুলো দুনিয়াজোড়া আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে। সব আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাই কোনো না কোনো বড় শক্তির স্বার্থে তৈরি হয়েছে। ইন্টারনেটও তার ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর তথ্য ও যোগাযোগের প্রয়োজনে কমপিউটার ব্যবহার থেকেই আজকের ইন্টারনেট তৈরির শুরু। একদিকে ইন্টারনেট অবশ্যই ধনতন্ত্রের সহায়ক। এর মধ্যে দিয়ে বাজারের প্রয়োজনে তথ্য আদান প্রদান, হিসেব রাখা, সবকিছুই চলে। এই তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ না হলে আজকের বিশ্বায়নকে সম্ভব করে তোলাই যেত না। কিন্তু ইন্টারনেট আজ আবার শুধু ব্যবসায়িক কাজেই আটকে নেই। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-মেল-এর (কথাটা ইলেকট্রনিক মেল থেকে ছোট করে নেওয়া) মাধ্যমে। আমাদের কেউ কেউ হয়তো ইতিমধ্যেই ই-মেল ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত। এই যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু ধনতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন গড়ে

উঠতেও দেখছি। আজকে পৃথিবীতে হাজার হাজার ছোট বড় সংগঠন আছেন যাঁরা পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের জন্য, নিয়মিতভাবে ই-মেলকে ব্যবহার করছেন। আবার ই-মেল যে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় যোগাযোগের জন্যই ব্যবহার হচ্ছে তাও নয়। আমরা দেখছি, প্রতিবাদ মিছিল, সভা সমাবেশ, ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন বিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন—অনেক কিছুর সংগঠনে একটা মূল যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করছে ই-মেল। এই সুবিধে না থাকলে এত কম খরচায় এত দ্রুত এত মানুষকে এক সঙ্গে করা যেত না। অর্থাৎ ঘুঘুকে ফাঁদে ফেলার জন্য যে ফাঁদ, সে ফাঁদ ঘুঘুও তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

ইন্টারনেট যদি বিশ্বজোড়া যোগাযোগের একটা জায়গা তৈরি করে থাকে যেখানে বহু মানুষের গলা আমরা শুনতে পাই, গ্লোবাল টেলিভিশন সেই তুলনায় অনেক বেশি ধনতন্ত্রের সরাসরিভাবে কুক্ষিগত। বড় বড় দেশের বড় বড় সংস্থা একে নিয়ন্ত্রণ করে, এর মূল কাজ হচ্ছে দুনিয়া জুড়ে বড় বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে দেওয়া। পকেটে রেস্ত না থাকলে এ বাজারে ঢোকা সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও দেখা যাবে কয়েকটা

বড় ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনই টেলিভিশন ছেয়ে আছে, ছোট ছোট হাজার হাজার স্থানীয় ব্যবসাদাররা জাতীয় টেলিভিশনে তো ঢুকতে পারেনই না, প্রাদেশিক টেলিভিশনেও ঢোকা কঠিন। কিন্তু তাই বলেও আবার টেলিভিশনকে পুরোপুরি একপেশেভাবে দেখলে আমরা ভুলই করব। হাজার চাপাচুপি সত্ত্বেও আজকে টেলিভিশনের পক্ষে সব খবর চেপে যাওয়া সম্ভব নয়। এর কারণও আবার অনেকটাই ধনতান্ত্রিক সংগঠনগুলোর মধ্যেই প্রতিযোগিতা। আজ ইরাকে আবু ঘ্রাইব জেলে মার্কিন সেনাদের বর্বরতার গল্প যদি এ-চ্যানেল না দেখায় ও-চ্যানেল দেখিয়ে দেবে। যে দেখাবে সে বেশি দর্শক পাবে, তার বিজ্ঞাপন পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। অন্য চ্যানেলও চায় না পিছিয়ে পড়তে। খেয়াল করে দেখবেন সব চ্যানেলগুলোরই 'ব্রেকিং নিউজ' বলার জন্য কী হুড়োহুড়ি, অর্থাৎ আমার চ্যানেলে থাকো, টাটকা খবর আমিই আগে দিই, অন্য চ্যানেলে যেয়ো না। কারণ দর্শকের সংখ্যা আর গুণমান আবার চ্যানেলের রুটি রুজির জন্য জরুরি। এই ফাঁকফোকরগুলো দিয়ে কিন্তু পৃথিবীর মানুষ ধনতন্ত্রের আসল চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে, আমেরিকা নিশ্চয়ই চায়নি যে তার ন্যায়যুদ্ধের এই নোংরা চেহারাটা আমরা সবাই মিলে দেখে ফেলি, কিন্তু আটকাতেও

পারেনি। কাজেই কোনো প্রক্রিয়াকেই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যে কত কঠিন সে কথাটা আবার প্রমাণ হলো।

আমরা এর আগে দেখেছি যে বিশ্বায়ন যে ধনতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মূল ফোকাস বদলে গিয়েছে। অতি উৎপাদন, মন্দার ইতিহাস পেরিয়ে এসে ধনতন্ত্রের এখন প্রাথমিক লক্ষ্য হলো বাজার তৈরি করা, আজকের ধনতন্ত্রের মূল নায়ক আর শ্রমিক নয়, ক্রেতা। তার মন পাওয়ার জন্য, তার মধ্যে ভোগের অভ্যাস তৈরি করার জন্য, তার লোভকে সাংঘাতিক রকম বাড়ানোর জন্য, (যাতে সে সেই লোভকে প্রশ্রয় দেওয়ার অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর জন্যেও লড়ে যায়) ধনতন্ত্র এখন উঠে পড়ে লেগেছে। বাজার যে শুধু দোকান খুলে জিনিস বেচে তাই নয়। এমন একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করে যাতে একদিকে আমরা তার জোরের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্যও হই, আবার অন্যদিকে এর থেকে কিছু কিছু ক্ষমতা পাচ্ছি ভেবে সম্মতিও দিই। আমাদের অভিজ্ঞতাটাই একবার দেখি না—একদিকে সঞ্চয়ের সুদের হার কমিয়ে, জীবনে সবরকমের সুরক্ষা কমিয়ে দিয়ে এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হচ্ছে যাতে আমাদের রোজগারের সব টাকাটাই সঙ্গে সঙ্গে বাজারে চলে আসে। জমিয়ে তো কোনো লাভ নেই, কাজেই খরচ করে ফেলাই যাক, এরকম একটা আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। মধ্যবিত্ত আরো বেশি বেশি করে শেয়ার ইত্যাদিতে টাকা রাখছে। ফলে বাজারের সাফল্যে আমাদের একটা স্বার্থ তৈরি হচ্ছে। আমরা বাজারের বিভিন্ন কর্মসূচিকে সমর্থন করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে পড়ছি। অন্যদিকে এই বাজারই তো আমাদের চারপাশে চাকরি খাচ্ছে, আমাদের ভি আর এস নিতে বাধ্য করছে, সেই সামান্য টাকা আবার আমরা বাজারের ফাটকাতেই লাগাতে বাধ্য হচ্ছি। এর মধ্যে দিয়ে আমাদের নাগরিক সত্তা, আমাদের শ্রমিক সত্তা বনাম আমাদের শেয়ারহোল্ডার সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। সামান্য লোভ দেখিয়ে বাজার অর্থনীতি আসলে আমাদের নিজেদের স্বার্থ বিরোধী শিবিরের হয়ে খেলতে বাধ্য করছে।

আবার ক্রেতারা কেবলই বাজারের দড়ির টানে নাচছেন, একথা ভাবারও কোনো কারণ নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সক্রিয় ক্রেতা প্রতিরোধ আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেশেই কিছুদিন আগে কীটনাশক দূষিত জল ব্যবহার করা হচ্ছে এই অভিযোগে কোল্ড ড্রিংক বয়কট আন্দোলন দারুণ জোরদার হয়ে উঠেছিল। মজার কথা এই যে কোনো কেন্দ্রীয় সংগঠন এর ডাক দেয়নি, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ এই বয়কট করেছিল, যাতে এই বহুজাতিক সংস্থাগুলি কেঁপে গিয়েছিল।

বিকল্পের খোঁজ : যে বিকল্প বিশ্বের কথা আমরা ভাবতে চাই তাকে নিয়ে ভাবতে গেলে, তাকে সম্ভব করে তুলতে গেলে অবশ্যই বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে, বিকল্প রাজনৈতিক কাঠামোর কথা ভাবতে হবে, কিন্তু আমরা যদি বিকল্প

সংস্কৃতির কথা না ভাবতে পারি, তবে আমরা কিছুই করতে পারব না। আর এই চ্যালেঞ্জটা সত্যিই কঠিন চ্যালেঞ্জ। সমাজতান্ত্রিক দেশের উদাহরণে আমরা দেখেছি যে 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ' কথাটা কী রকম সত্যি হয়ে উঠতে পারে। বিকল্প শিক্ষা নিয়ে যিনি অনেক চিন্তা করেছেন সেই পাওলো ফ্রেইরের মতে, আমরা কতগুলো আদর্শ চরিত্রকে অনুকরণ করতে শিখে বড় হই। নিজেদের মধ্যে এঁদের ক্ষমতাগুলোকে নকল করার চেষ্টা করি। একজন শ্রমিকও সেরকম মালিকের ক্ষমতাকে হারানোর জন্য নিজে মালিকের ক্ষমতাগুলোকেই নকল করার চেষ্টা করে। কোথাও গিয়ে তাই কোনো সত্যিকারের বিকল্পের সম্ভাবনাটা নষ্ট হয়ে যায়। তাই যদি ধনতন্ত্রকে দীর্ঘকালীনভাবে মোকাবিলা করতে হয় তবে তার আদর্শগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার, হারিয়ে দেওয়ার মতো বিকল্প ভাবতে হবে—শুধু একই পদ্ধতির মালিকানা বদলে, একই আধুনিকতার পথে চলে সেই বদল আনা সম্ভব হবে না। তার মানে কিন্তু আমরা অবশ্যই সব কলকারখানা তুলে দিয়ে কোনো জঙ্গলের জীবনে ফিরে যাওয়ার কথা বলছি না। আমরা যেটা বলছি সেটা হলো সামগ্রিকভাবে লাভ ক্ষতি বিচার করার একটা আন্দোলন, একটা বোধের প্রচার করার কথা। ইতিহাসের পেরিয়ে আসা মুহূর্তগুলোর তুলনায় কিন্তু আজ গোটা পৃথিবী জুড়ে এই ভাবনা শুরু করার সুযোগ বেশি। ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের মতো মঞ্চ এই কাজই করছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম বিশ্ব জুড়ে ভাববার, কাজ করবার সুযোগ আগে কখনো

আসেনি। আমেরিকার শ্রমিক আজ বুঝছেন যে ধনতন্ত্রের আসলে কোনো দেশ নেই, লোভের স্বার্থে সে সব দেশের মানুষের স্বার্থ ধ্বংস করতে প্রস্তুত। লাভ বেশি হচ্ছে বলে আজ আমেরিকার কাজ ভারতে চলে আসছে, কাল রুমানিয়ায় চলে যাবে। আজ জার্মান কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো মাফিয়া ব্রাজিলের জঙ্গল ধ্বংস করছে, কাল সেখানকার সম্পদ শেষ হলেই অন্য কোথাও হাত পড়বে। মানুষ এও বুঝতে পারছে যে পরিবেশের শৃঙ্খল পৃথিবীজোড়া। ব্রাজিলের জঙ্গল শেষ হয়ে গেলে পৃথিবী জুড়ে গরম বাড়বে, উত্তর মেরু গলে গেলে ইংল্যান্ড সমুদ্রে তলিয়ে যাবে। শ্রীলংকার সমুদ্রে আজ পারমাণবিক বর্জ্য ঢাললে কাল কানাডার জল বিষিয়ে যাবে। পরিবেশ, শ্রম, জীবন, জীবিকা—সবই এক সুতোয় বাঁধা। প্রশ্ন হলো এই বোধগুলোকে নিয়ে আমরা কি সবার জন্য লাভের হিসেব করে এক অন্য পৃথিবীর দিকে এগোতে পারব? না কিছু মানুষের লোভের মিথ্যে গল্পে ভুলে আমরা হারব? বিশ্বায়নের এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতেই হবে।

দুনিয়াজোড়া প্রতিবাদের দিনলিপি

১৯৯৪

একদিকে নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট যখন জমির ওপর যৌথ মালিকানাকে বে-আইনি ঘোষণা করে, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোর পাশে জাপাতিস্তা বিপ্লবীরা তখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেন 'ইয়া বাস্তা'—তার মানে যথেষ্ট হয়েছে (আর নয়)।

১৯৯৫

জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড বদলে গিয়ে যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন হয়ে যায়, তখন বিশ্বায়নের ওপর নজর রাখে কিছু সংস্থা, যেমন থার্ড ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক, এবং ফোকাস অন দ্য গ্লোবাল সাউথ। দুনিয়ার দেশে দেশে আইন কানুন প্রণয়ন ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এই নতুন সংস্থার অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক ক্ষমতার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

১৯৯৬

মেক্সিকোয় জাপাতিস্তারা প্রথম নিও-লিবেরালিজম-বিরোধী এবং মানবতাপন্থী আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন সংগঠিত করেন। এই প্রথম পৃথিবীর নানা প্রান্তের সামাজিক আন্দোলনের শক্তিগুলো একসঙ্গে হয়, নিজেদের দাবিগুলোর মধ্যে মিলগুলোকে বুঝতে পারে।

ফিলিপিনসে মুক্ত বাজারের সমর্থনে ডাকা প্যাসিফিক ইকনমিক কমিউনিটির সম্মেলনের বিরুদ্ধে বিশাল জনসমাবেশ সংগঠিত হয়। ১,৩০,০০০ ফিলিপিনো শ্রমিক এই প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন।

আমেরিকার সংগঠন পাবলিক সিটিজেন্‌স্-এর ইন্টারনেট সাইটের হোম পেজ-এ মালটিল্যাটারাল এগ্রিমেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট-এর একটা তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। এর ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াজোড়া জনমত তৈরি হয়। প্রমাণ হয় যে ইন্টারনেট এসে যাওয়ার ফলে মানুষে মানুষে যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে বিশ্বজোড়া সচেতনতা বাড়াবার সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে।

ইংল্যান্ডের লিভারপুলের বরখাস্ত ডক শ্রমিকদের সমর্থনে ২১টি দেশের ডক শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, মেক্সিকো, আলাস্কা—সর্বত্র বন্দরগুলো স্তব্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৭

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। আই এম এফ বা আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামোয় বদল ঘটানোর ফলে এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি হঠাৎ করে সরে যাওয়ার ফলেই এই সংকট দেখা দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। বিশ্বায়নের ঠুনকো কাঠামো এবং বিপজ্জনক নীতিগুলো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

জেনিভাতে একটি সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পিপলস গ্লোবাল অ্যাকশন নামক সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠন ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের এবং মুক্ত বাণিজ্যের ধারণার বিরোধী। আরজেনটিনা থেকে শুরু করে ইউরোপের প্রতিবাদী শিবিরগুলো, এমনকী কলম্বিয়ার এবং ভারতের কৃষকরাও এতে যোগ দেন।

রাষ্ট্রসংঘের শক্তিশালী জি-৮ দেশগুলো ব্রিটেনের বার্মিংহামে সভা করতে এলে ৭০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক তাঁদের নন-স্টপ ফোন করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঋণ মকুব করার দাবি জানান।

১৯৯৮

জেনেভায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের হেড অফিসে ১০,০০০ মানুষ মিছিল করে যান, ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়ন ও সেই প্রক্রিয়াতে এই সংস্থার ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। সারা পৃথিবীতে আমরা এই প্রতিবাদের ঝড় দেখতে পাই। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে ৪০,০০০ গৃহহীন মানুষ সুপার মার্কেটগুলোর বাইরে অবস্থান

শুরু করেন। ম্যানিলায় জেলেরা মিছিল করেন। কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েই চলেছে এমন এক পটভূমিকায় ভারতের হায়দ্রাবাদে লক্ষ লক্ষ চাষি, শ্রমিক, আদিবাসী মানুষেরা জমায়েত হয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের সঙ্গে ভারতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানান। দক্ষিণ কোরিয়ার ইউনিয়নগুলো ধনতন্ত্রের বিশ্ব শাসনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়।

১৯৯৯

আমেরিকার সিয়াটল শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের মিটিং প্রতিবাদীরা কার্যত বানচাল করে দেয়। উন্নতিশীল দেশগুলোর কাছ থেকে তুমুল বাধার সম্মুখীন হয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন নতুন কোনো উদারীকরণের প্রস্তাব কার্যকরী করতে পারে না। বহুজাতিকদের বিশ্ববাণিজ্যের ওপর একচেটিয়া রাজত্ব করার অভ্যাস এই প্রথম বড় পরাজয়ের স্বাদ পায়।

ভারতের নর্মদা আন্দোলনের তরুণ সদস্যরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন বিরোধী মোষের দৌড় সংগঠিত করেন।

ফ্রান্সের ৮০টি শহরে ৭৫,০০০ মানুষ ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন। চাষিরা তাঁদের ভেড়া, হাঁস ও ছাগল নিয়ে ইফেল টাওয়ারের নীচে প্রতিবাদে জমায়েত হন।

ম্যানিলাতে হাজার হাজার মানুষ আসিয়ান ফ্রি ট্রেড সামিট-এর নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ভেঙে ভেতরে ঢুকে প্রতিবাদ করেন।

২০০০

সুইটজারল্যান্ডের ডেভোস-এ বিক্ষোভকারীরা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠক ঘেরাও করেন।

খোদ আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি-তে ৩০,০০০ মানুষ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের বার্ষিক সভার বিরুদ্ধে পথে নামেন।

থাইল্যান্ডের চিয়াং মাইতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের 'মিটিং রোকো' আন্দোলনে হাজার হাজার চাষি, ছাত্র এবং এই ব্যাঙ্কের গরিব-বিরোধী নীতির বিরোধী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো যোগ দেয়।

৬০ লক্ষ ব্রাজিলের নাগরিক নিজেরাই একটা মতামতের ভোটের মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজ়েশনের চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোকে অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ব্রাজিল, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, আরজেন্টিনা, মেক্সিকো, হন্ডুরাস, প্যারাগুয়েতে 'বাদ পড়া মানুষদের আওয়াজ' নামে মিছিল বেরোয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে এশিয়া ইউরোপ শীর্ষ বৈঠকের সময় ২০,০০০ জঙ্গি শ্রমিক এবং ছাত্ররা পথে নামে এবং আওয়াজ তোলে—আমরা নিও-লিবেরেলিজ়ম ও বিশ্বায়নের বিরোধী।

মানুষের জন্য জমি আর বিষমুক্ত খাবারের দাবিতে একটা ক্যারাভ্যান ভারত, বাংলাদেশ ও ফিলিপিনসের মধ্যে দিয়ে ঘোরে।

২০০১

সুইটজারল্যান্ডের ডেভোসে, ধনতন্ত্রের মাথাদের নিয়ে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম চলাকালীন ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রো শহরে এক বিকল্প ভাবধারা নিয়ে সমান্তরাল সম্মেলন ডাকা হয়। এই ফোরামেই ঘোষণা করা হয়: আরেকটা দুনিয়া সম্ভব। এই স্লোগান এখন বিকল্প বিশ্বের জন্য আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে এবং এই সম্মেলনই এখন ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরাম নামে এক গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প মঞ্চ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওষুধের কোম্পানিগুলো এইডস-এর জরুরি ওষুধের পেটেন্ট নিয়ে তার জোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলে, প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার বহু মানুষ বিক্ষোভে সামিল হন।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভয়ে মিটিং-এর জায়গা সিয়াটল থেকে সরিয়ে হনলুলু নিয়ে

যাওয়ার পরও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ককে নাবিকদের রোষের সামনে পড়তে হয়।

ভারত, ব্রাজিল এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জেনেটিকালি এঞ্জিনিয়ারড বীজ ব্যবহারের প্রতিবাদে চাষিরাই শস্য পুড়িয়ে ফেলে।

মেক্সিকোর কানকুনে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বৈঠকে শত শত বিক্ষোভকারী মানুষের ওপর পুলিশি আক্রমণ চলে।

২০০২

ব্রাজিলের পোর্তো অ্যালেগ্রোতে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি অবধি দ্বিতীয় ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরাম বসে, ১২৩টি দেশের প্রতিনিধিরা আসেন। বর্তমান বিশ্বায়নের সমস্যা ও বিকল্প পন্থার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে।

স্পেনের বার্সেলোনায় ৫ লক্ষ মানুষ ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের প্রতিবাদে পথে নামেন।
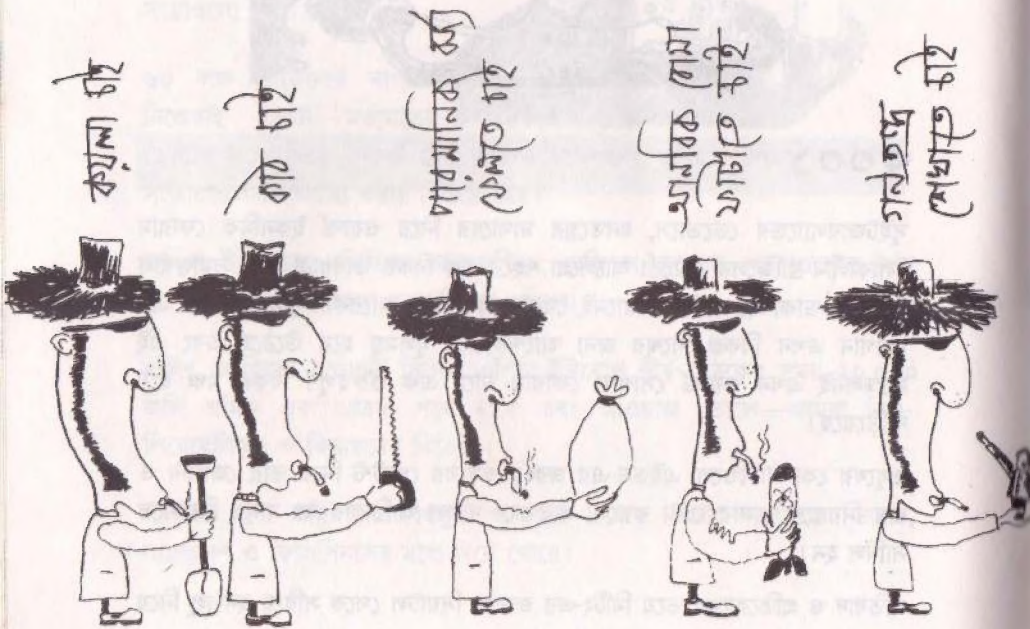
আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি-তে লক্ষাধিক মানুষ আই এম এফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের নীতি এবং ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকার সামরিক বাড়াবাড়ি নিয়ে বিক্ষোভ জানান।

বছরের মাঝামাঝি গোটা দক্ষিণ কোরিয়া জুড়ে শ্রমিকরা কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে ও ইউনিয়নের অধিকারের ওপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ধর্মঘট করেন।

২০০৩

ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রোতে তৃতীয় ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরাম সংগঠিত হয় বছরের শুরুতে, এবারে ১২৩টি দেশ থেকে লক্ষাধিক মানুষ এই সম্মেলনে আসেন। বোঝা যায় যে এই ফোরাম বর্তমান বিশ্বায়ন বিরোধী শক্তিগুলোর একটা শক্তিশালী মঞ্চ হয়ে উঠছে। যেখানে বাজারের আধিপত্যের বিরোধিতা করে মানুষের উন্নয়নের পথ খোঁজার চেষ্টা চলছে।

ভারতের হায়দ্রাবাদে এশিয়ান সোশাল ফোরাম সংগঠিত হয়, এখানে এশিয়ার নানা দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি যোগ দেয়।

ফ্রান্সে বিশ্বায়ন-বিরোধী বহু প্রতিবাদ চলতে থাকে। জি ৮ সম্মেলনের সময় প্রায় ১ লক্ষ মানুষ বিক্ষোভ জানান।

ব্রিটিশ পুঁজি সমর্থিত সংস্থা প্যাসিফিক এল এন জি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলিভিয়ার প্রাকৃতিক গ্যাস ক্যালিফোরনিয়ায় রপ্তানি করে দেওয়ার বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ফলে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট গনজালো সানচেজ দা লোজাডা-র পতন ঘটে।

আমেরিকার মায়ামিতে 'ফ্রি ট্রেড ওফ দি আমেরিকান এগ্রিমেন্ট' বৈঠকে বিক্ষোভকারীদের ওপর কঠোর পুলিশি অত্যাচার নেমে আসে।

বিশ্বব্যাঙ্কের আর আই এম এফ-এর ৬০তম জন্মদিনে এই সংগঠনগুলোকে 'অশুভ জন্মদিন' বার্তা লেখা কার্ড পাঠানো হলো। সই করলেন আমেরিকার ৪০টি রাজ্যের এবং পৃথিবীর ২৩টা দেশের বহু নাগরিক। এই কার্ডে দাবি জানানো হলো গরিব দেশের ঋণগুলো কোনো ক্ষতিকর শর্ত ছাড়াই বাতিল করে দিতে হবে।

২০০৪

ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের চতুর্থ সম্মেলন এবার আমাদের দেশে, মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় জানুয়ারি মাসে। ফলে আমাদের দেশের বহু মানুষের বিকল্প বিশ্ব নিয়ে পৃথিবী জুড়ে কী ভাবনাচিন্তা হচ্ছে সেটা জানার সুযোগ হয়। গোটা পৃথিবী জুড়ে যে আরো লক্ষ কোটি মানুষ আমাদের মতোই বিকল্প নিয়ে ভাবছে, এটা জানতে পারা, তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করাই এই ফোরামের আসল উদ্দেশ্য। সবাই অবশ্য এটাকে সেভাবে দেখেন না। কেউ কেউ মনে করেন এটা বিশ্বপুঁজির ছকবাজির একটা অংশ, যেখানে বিকল্পের নামে আসলে আমাদের প্রতিবাদকেও ধনতন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। এই বিরোধী মতবাদীরা ওয়ার্ল্ড সোশাল ফোরামের ঠিক উল্টোদিকে মুম্বাই রেজিস্ট্যান্স নামে আর একটি সম্মেলন করেছিলেন।

(নিউ ইন্টারন্যাশানালিস্ট ম্যাগাজিন-এর সেপ্টেম্বর ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্যের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।)

এই বইয়ে ব্যবহৃত তথ্যসূত্রঃ

১. স্টুয়ার্ট হল। *রিপ্রেসেন্টেশন। কালচারাল রিপ্রেসেন্টেশনস অ্যান্ড সিগনিফাইং প্যাকটিসেস*। লন্ডন : সেজ পাবলিকেশনস, ২০০২।

২. বাগচি, অমিয়কুমার। *গ্লোবালাইজ়েশন, এ স্কেচ*। সেকান্দ্রাবাদঃ আজাদ রিডিং রুম। তারিখ দেওয়া নেই।

৩. গ্রামশি, আনটোনিও। *সিলেকশনস্ ফ্রম দ্য প্রিজ়ন নোটবুকস*। নিউইয়র্কঃ ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

৪. *ভারতের অর্থনীতি এখন, সরকারি প্রচার ও আসল চেহারা*। পূর্ব কলকাতা নাগরিক মঞ্চ, ২০০৪।

৫. *ওয়ার্ল্ড সারভে অফ রোল অফ উইমেন্স ডেভেলপমেন্টঃ গ্লোবালাইজেশন অ্যাণ্ড জেন্ডার অ্যাট ওয়ার্ক*। নিউ ইয়র্কঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৯৯৯। -

৬. সুন্দরম, কে। 'এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন ইন দ্য নাইনটিজ।' *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি*, ১৭ মার্চ ২০০১।

৭. মুখোপাধ্যায়, মুকুল। *মার্কেটেবেল স্কিলস্ ইন দ্য ওয়েক অফ গ্লোবালাইজ়েশন : আ স্টাডি ইন দি ইন্ডিয়ান কনটেকস্ট*। ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন, ২০০৪।

৮. মালিনী ভট্টাচার্য। *তিনটি নাটিকা*। কলকাতা : অবভাস, ২০০৩।

আলাপ ১

বিষয় বিশ্বায়ন

লেখা : **রংগন চক্রবর্তী**। ছবি : **অমিতাভ মালাকার**।

চারদিকে যে আমরা অহরহ শুনছি বিশ্বায়ন বিশ্বায়ন, আসলে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী? প্রশ্নটা হয়তো মাথায় ঘুরছিল কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করে উঠতে পারেন নি। এবার সহজ ভাষায় সোজাসুজি একটা আলোচনা করার সুযোগ আপনার হাতে। বিশ্বায়ন কবেই বা শুরু হলো? কোন দিকেই বা এগোচ্ছে? আমাদের সঙ্গে বিশ্বায়নের সম্পর্কই বা ঠিক কী? বিশ্বায়ন কি একটা একমুখো স্রোত? না কি এর অনেক দিক আছে, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, ফাঁক ফোকর আছে, যা কেউই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না? যে বিশ্বায়নের মধ্যে আমরা আছি, তাতে লাভ কার, ক্ষতিই বা কার? যা ঘটছে তাই কি ঘটে যাবে? না কি বদলাবে? কী ভাবে বদলাতে পারে? এ রকম আরো হাজার বিষয় নিয়ে সাদা বাংলায় আলাপ—শুধু কথায় নয়, ছবিতেও।

রংগন চক্রবর্তী প্রায় ২৫ বছর ধরে বিজ্ঞাপন লেখা, সংবাদপত্রের বিভাগ সম্পাদনা করা, বাংলায় সিরিয়াল লেখা, টেলিফিল্ম বানানো, গান লেখা, বেশকিছু দেশে বিভিন্ন সংস্থার জন্য কমিউনিকেশনের কাজ ও পড়ানো, সবেতেই হাত লাগিয়েছেন। এছাড়া করেছেন গবেষণা—ডি ফিলের বিষয় ছিল আধুনিক বাংলা গানের রাজনীতি।

অমিতাভ মালাকার লেখেন, ভাবেন, ছবি আঁকেন, ফিল্ম বানান। ছবি আঁকতে শেখেননি কোথাও, নিজেই আঁকেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে নিয়ে বানানো তাঁর ছবি ইলিয়াসের খোয়াবনামা প্রশংসিত হয়েছিল।

ISBN 81-902306-0-3

৬০ টাকা

প্রচ্ছদ : অমিতাভ মালাকার।
নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।